Ekattorer Dinguli by Janahara Imam

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com

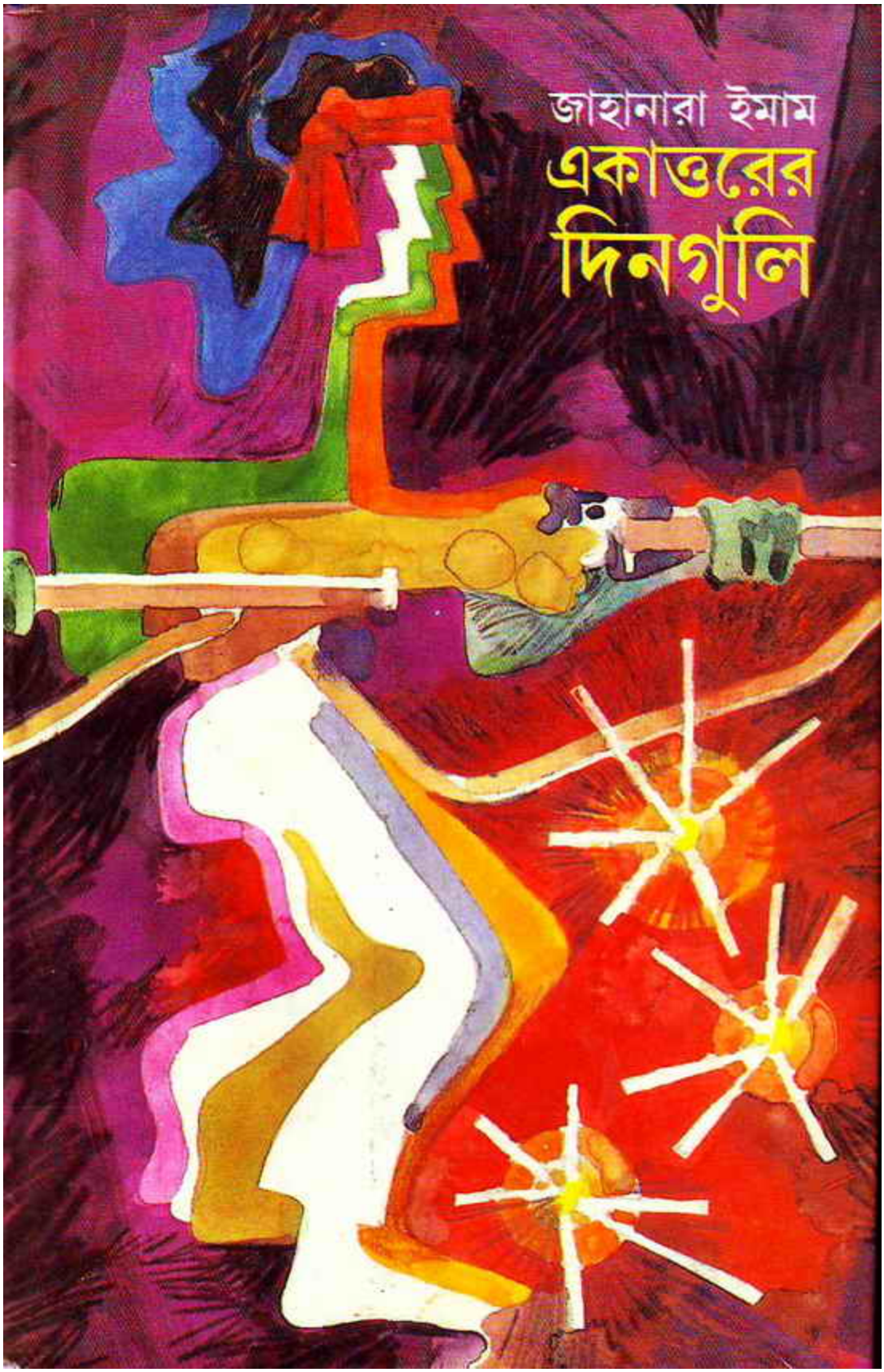
জাহানারা ইমাম
একাত্তরের
দিনগুলি

তবে তাই হোক। হৃদয়কে পাথর করে, বুকের
গহীনে বহন করা বেদনাকে সংহত করে দুঃখের
নিবিড় অতলে ডুব দিয়ে তুলে আনি বিন্দু বিন্দু
মুক্তোদানার মতো অভিজ্ঞতার সকল নির্যাস।
আবার আমরা ফিরে তাকাই আমাদের চরম শোক
ও পরম গৌরবে মণ্ডিত মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর
দিকে। এক মুক্তিযোদ্ধার মাতা, এক সংগ্রামী
দেশপ্রেমিকের স্ত্রী, এক দৃঢ়চেতা বাঙালী নারী
আমাদের সকলের হয়ে সম্পাদন করেছেন এই
কাজ। বুকচেরা আর্তনাদ নয়, শোকবিহ্বল ফরিয়াদ
নয়, তিনি গোলাপকুঁড়ির মতো মেলে ধরেছেন
আপনকার নিভৃততম দুঃখ অনুভূতি। তাঁর
ব্যক্তিগত শোকস্মৃতি তাই মিলেমিশে একাকার হয়ে
যায় আমাদের সকলের টুকরো টুকরো অগণিত
দুঃখবোধের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, তাঁর আপনজনের
গৌরবগাথা যুক্ত হয়ে যায় জাতির হাজারো
বীরগাথার সঙ্গে। রুমী বুঝি কোন অলক্ষ্যে হয়ে
যায় আমাদের সকলের আদরের ভাইটি, সজ্জন
ব্যক্তিত্ব শরীফ প্রতীক হয়ে পড়েন রাশভারী
স্নেহপ্রবণ পিতৃরূপের।
কিছুই আমরা ভুলবো না, কাউকে ভুলবো না, এই
অঙ্গীকারের বাহক জাহানারা ইমামের গ্রন্থ নিছক
দিনলিপি নয়, জাতির হৃদয়ছবি ফুটে উঠেছে
এখানে।

1971

১ মার্চ সোমবার ১৯৭১

আজ বিকেলে রুমী ক্রিকেট খেলা দেখে তার বন্ধুদের বাসায় নিয়ে আসবে হ্যামবার্গার খাওয়ানোর জন্য।

গোসল সেরে বারোটার দিকে বেরোলাম জিন্না এভিনিউয়ের পূর্ণিমা স্ন্যাকবার থেকে ডিনার-রোল কিনে আনার জন্য।

দু'ডজন ডিনার-রোল কিনে সোজা চলে এলাম বাড়ির কাছের নিউ মার্কেটে। গত দুই সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রায়ই বিভিন্ন দোকানে খোঁজ করি পূর্ব পাকিস্তানের তৈরি সাবান, তেল, টুথপেস্ট, বাসন-মাজা পাউডার ; কিন্তু পাই না। একমাত্র ইভা বাসন-মাজা পাউডারটাই এখানকার তৈরি—বলা যেতে পারে সবে ধন নীলমণি। পিয়া নামের এক ঢাকাই টুথপেস্ট বাজারে বের হবো-হবো করে এখনও বের হতে পারছে না, আল্লাই মালুম কি কঠিন বাধার জন্য !

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেড়টা। দরজা খুলে দিয়েই বারেক জানাল : 'সাবরে ফুন করেন আম্মা। খাবার-দাবার কিন্যা রাখতে কইছে। কই জানি গণ্ডগোল লাগছে।'

গণ্ডগোল ? তা লাগতেই পারে। গত দু'মাস থেকেই তো ঢাকা তপ্ত কড়াই হয়ে রয়েছে। অফিসে ফোন করতেই শরীফ জানাল : 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেলা একটার সময় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শহরে সব জায়গায় হৈচৈ পড়ে গেছে। লোকেরা দলে দলে অফিস-আদালত ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানকার সব দর্শক শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এখানে মতিঝিলে তো দারুণ হৈচৈ হচ্ছে চারদিকে। কেন, নিউ মার্কেটের দিকে কিছু দেখ নি ?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'ঐ সময়টা আমি পেছনদিকের দোকানগুলোয় ছিলাম, ঠিক খেয়াল করি নি। ওখানকার লোকেরা হয়ত এখনো শুনে ওঠে নি।' তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রুমী-জামী যে স্টেডিয়ামে !'

শরীফ বলল, 'চিন্তা করো না। ওরা বেরিয়েই আমার অফিসে এসেছিল। জামীকে এখানে রেখে রুমী ওর বন্ধুদের কাছে গেছে। শোনো, বেশ গোলমাল হবে। এখানে অল-রেডি মিছিল বেরিয়ে গেছে। বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়ামের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খবর পেলাম। গোলমাল বাড়লে কারফিউ দিয়ে দিতে পারে। ঘরে খাবার-দাবার আছে কিছু ? না থাকলে এক্ষুণি কিনে রাখ।'

তক্ষুণি আবার বেরোলাম। এলিফ্যান্ট রোডে উঠতেই দেখি—দু'পাশের ছোট ছোট দোকানগুলোতে লোকজনের অস্বাভাবিক ভিড়। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে কেনাকাটা করছে। দোকানীরা দিয়ে সারতে পারছে না। আমিও দু'তিনটে দোকান ঘুরে, ভিড়ের মধ্যে

www.Murchona.com
sumon_ahm@yahoo.com

গুঁতোগুঁতি করে, টোস্ট বিস্কুট, চানাচুর, দেশলাই, মোমবাতি, গুঁড়ো দুধ, ব্যাটারি এসব কিনলাম। বাড়িতে এসেই বারেকের হাতে খালি কেরোসিনের টিন আর সুবহানের হাতে খালি বস্তা ধরিয়ে পাঠিয়ে দিলাম কেরোসিন আর চাল কেনার জন্য।

এইসব করতে করতে শরীফ আর জামী এসে গেল অফিস থেকে। প্রায় তিনটে বাজে। টেবিলে বেড়ে রাখা খাবারের ঢাকনা তুলে খেতে বসে জিগ্যেস করলাম, 'আর খবর কি ?'

'শেখ মুজিব হোটেল পূর্বাণীতে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। আসার সময় দেখি হোটেলের সামনে তিনটে রাস্তাই একেবারে মেইন রোড পর্যন্ত লোকে ঠাসা। সবার হাতে লোহার রড আর বাঁশের লাঠি। অফিস থেকে বেরিয়ে দৈনিক পাকিস্তানের দিক দিয়ে গাড়ি নিতে পারলাম না ভিড়ের চোটে। শেষে গভর্নমেন্ট হাউসের পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গুলিস্তান ঘুরে এসেছি। রুমী এখনো ফেরে নি ?'

এবার আমিই শান্তস্বরে বললাম,' এই হৈ চৈতেকোথাও আটকে গেছে মনে হয়। খেলার শেষে বন্ধুদের নিয়ে হ্যামবার্গার খেতে আসার কথা। এখন খেলা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, হয়ত আগেই আসবে।'

চারটে বাজল, পাঁচটা বাজল। রুমীর দেখা নেই। সাড়ে চারটের মধ্যে দুই ডজন হ্যামবার্গার বানিয়ে আভ্‌নয়ে মৃদু গরমে রেখে দিয়েছি।

সন্ধে পেরিয়ে রাত এসে গেল। রুমী এল আটটারও পরে। একা। বিকেল-সন্ধে বাগানে পায়চারি করতে করতে আমার রাগ উপে উদ্বেগ দানা বাঁধছিল মনে। রুমীকে দেখেই রাগ আবার ঝাঁপিয়ে এল সামনে। রুমী আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে, মুখে হৃদয়-গলানো হাসি ভাসিয়ে বলল, 'আগে শোনো তো আমার কথা। কত কি যে ঘটে গেল একবেলায়। সবকিছুর স্কুপ-নিউজ এখুনি দিতে পারি তোমায়। নাকি, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে খবর কাগজের জন্য ?'

আমি হাসি চেপে ভ্রূকুটি বজায় রেখে বললাম, 'কি তোমার স্কুপ-নিউজ, শুনি ?'

'অনেক, অনেক। একেবারে গোড়া থেকে বলি। একটার সময় স্টেডিয়ামে ছিলাম। অনেক দর্শকই সঙ্গে রেডিও নিয়ে গিয়েছিল। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা যেই না কানে যাওয়া, অমনি কি যে শোরগোল লেগে গেল চারদিকে। মাঠ-ভর্তি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক—সবাই জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি জামীকে আব্বুর অফিসে রেখে ছুটলাম ইউনিভার্সিটিতে। ওখানেও একই ঘটনা। রেডিও'র ঘোষণা শোনামাত্রই ছেলেরা সবাই দলে দলে ক্লাস থেকে, হল থেকে বেরিয়ে বটতলায় জড়ো হতে শুরু করেছে। আমি যখন পৌঁছলাম, তখনো ছেলেরা পিলপিল করে আসছে চারদিক থেকে। মনে হল সমুদ্রের একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বটতলায়। তখুনি ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা ঠিক করল বিকেল তিনটেয় পল্টন ময়দানে মিটিং করতে হবে।'

'পল্টনে মিটিং হল ? দেড়টা-দুটোয় বলল আর তিনটেয় মিটিং হল ?'

'হল মানে ? সে তুমি না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না আম্মা। এ্যা-তো লোক। এ্যাতো লো-ক! উঃ আল্লারে। কিন্তু মিটিংয়েরও আগে তো পূর্বাণীতে শেখ মুজিব প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। উনি অবশ্য সকাল থেকেই ওখানে ওঁদের দলের পার্লামেন্টারি

বৈঠকে ছিলেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণার এক ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক বাঁশ লাঠি আর লোহার রড ঘাড়ে নিয়ে পূর্বাণীর সামনে সবগুলো রাস্তা জ্যাম করে ফেলল। সেকি শ্লোগান। পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ আর জিন্নার ছবিও পুড়িয়েছে। শেখ তক্ষুণি সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা দিলেন হরতালের আর ৭ মার্চ রেসকোর্সে মিটিংয়ের।'

মনটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে। শরীফও বলেছে পূর্বাণীর সামনে ভিড়ের কথা। তবু মুখের বেজার ভাবটা বজায় রেখে বললাম 'এত ঝ-ঝাটের মধ্যে দু'ডজন হ্যামবার্গার ঠিকই বানালাম। কিন্তু তোদের কারো মনে নেই সে কথা।'

'মনে থাকার যো আছে আম্মা ? কি যে খই ফুটছে সারা শহরে! গুলিস্তানের মোড়ে কামানের ওপর দাঁড়িয়ে মতিয়া চৌধুরী যা একখানা আগুন ঝরানো বক্তৃতা দিলেন না, শুনলে তোমারও গায়ে হল্কা লাগত। সাধে কি আর ওঁকে সবাই অগ্নিকন্যা বলে।'

আমি আবার ক্ষেপে উঠলাম, 'এইবার গুল মারছিস। তুই একা এতগুলো জায়গায় এক বিকেলে গেলি কেমন করে ?'

রুমী খুব বেশি রকম অবাক হয়ে বলল, 'খুবই সিম্পল। বন্ধুর হোন্ডার পেছনে চড়ে সবখানে টহল দিয়েছি। আমরা কি এক জায়গায় বসে নেতাদের বক্তৃতা শুনেছি নাকি? স্টেডিয়াম থেকে ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে পূর্বাণী, পূর্বাণী থেকে গুলিস্তান মোড়ের কামান, সেখান থেকে পল্টন—এমনি করে চরকিঘোরা ঘুরেছি না ?'

'সারাদিন খাওয়া হয় নি নিশ্চয় ?'

'কেই-বা খেয়েছে ? ঐ একটার আগে যে যা খেয়েছে চা-বিস্কুট—ব্যস। আর খাওয়া-দাওয়া নেই। বাঁশের লাঠি, লোহার রড—যে যা পেয়েছে, একেকখানা ঘাড়ে নিয়ে সবাই রাস্তায় নেমে গেছে। তবে এতক্ষণে টের পাচ্ছি সারাদিন খাওয়া হয় নি।'

'চল চল, আগে খেতে বস। খাওয়ার পর বাকিটা শুনব।'

'ঐ হ্যামবার্গারই দাও আমায়। নষ্ট করে কি লাভ ? তোমরাও সবাই ঐ দিয়েই রাতের খাওয়া সেরে ফেল।'

'গুষ্ঠিসুদ্ধ খেয়েও কি সব ফুরোনো যাবে ?'

'চিন্তা করো না। আমি একাই ছয়টা খেয়ে ফেলব।'

শেখ মুজিব আগামীকাল ঢাকা শহরে, আর পরশুদিন সারাদেশে হরতাল ডেকেছেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের ঘোষণাও দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের কি পরিণাম হতে পারে, তা নিয়ে বহু রাত পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল খাবার টেবিলে বসে। রাত প্রায় বারোটার দিকে শুতে গিয়েও ঘুম এল না। অনেক দূর থেকে শ্লোগানের শব্দ আসছে। বোঝা যাচ্ছে এত রাতেও অনেক রাস্তায় লোকেরা মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছে। কেবল জয় বাংলা ছাড়া অন্য শ্লোগানের কথা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু তবু ঐ সম্মিলিত শত-কণ্ঠের গর্জন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে এসে পড়ছে শ্রুতির কিনারে। শিরশির করে উঠছে সারা শরীর। গভীর রাতে আধো-ঘুমে, আধো-জাগরণে মনে হল যেন গুলির শব্দও শুনলাম।

মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ হরতাল। সকালে নাশ্‌তা খাওয়ার পর সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলিফ্যান্ট রোডের মাঝখান দিয়ে খানিকক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম। একটাও গাড়ি, রিকশা, স্কুটার এমনকি সাইকেলও নেই আজ রাস্তায়। রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে যেন আমার বাড়ির উঠোন! হরতালের দিনে ফাঁকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটা আমাদের মত আরো অনেকেরই বিলাস মনে হয়। পাড়ার অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেটের দিকে চলে গেলাম। কি আশ্চর্য! আজকে কাঁচাবাজারও বসে নি। চিরকাল দেখে আসছি হরতাল হলেও কাঁচা বাজারটা অন্তত বসে। আজ তাও বসে নি। শেখ মুজিবসহ সবগুলো ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে সর্বত্র যানবাহন, হাটবাজার, অফিস-আদালত ও কলকারখানায় পূর্ণ হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে, সবাই সেটা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েই আজ হরতাল করছে।

নিউ মার্কেটের দিক থেকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে আবার উল্টোদিকে গেলাম হাতিরপুল পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে কিটিও হাঁটছে। রাস্তায় লোকেরা ওর সোনালি চুলের দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। ভাবছি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই।

বসার ঘরে ঢুকে রুমী 'আরেক কাপ চা হোক।' বলেই হাঁক দিল, 'সুবহা-ন।'

সুবহান এঘরে আসতেই আমি বললাম, 'পাঁচ কাপ চা দিয়ে যাও।'

সুবহান চা বানিয়ে এনে সেন্টার টেবিলে ট্রে-টা রেখে রুমীকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভাইয়া, তিনটার সুমায় পল্টনের মিটিংয়ে যাইবেন ?'

রুমী গম্ভীর গলায় শুধোল, 'কেন, তুমি যেতে চাও আমাদের সঙ্গে ?'

সুবহান কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'আম্মায় যুদি পারমিশুন দ্যান।'

আমি হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললাম, 'তাড়াতাড়ি রান্না সারতে পারলে যেতে পারবে।'

সুবহান কৃতার্থের হাসি হেসে প্রায় দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

রুমী নিচু গলায় বলল, 'ওর মধ্যে কিন্তু বেশ রাজনৈতিক চেতনা আছে।'

চা খেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আম্মা একটু বটতলা ঘুরে আসি। ছাত্রলীগ আর ডাকসু মিটিং ডেকেছে।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'এখন আবার হেঁটে হেঁটে অদ্দূর যাবার দরকারটা কি? তুই তো কোন দলের মেম্বার নস্। তোর এত সব মিটিংয়ে যাওয়া কেন ?'

রুমী বলল, 'এখন কি আর ব্যাপারটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে নাকি আম্মা ? এখন তো-এ আগুন ছড়িয়ে গেছে সবখানে।'

এই এক স্বভাব রুমীর। কথায় কথায় ইংরেজি-বাংলা কত যে কবিতার উদ্ধৃতি দিতে পারে ও। মনেও থাকে বটে। আমি নাচার হয়ে বললাম, 'যাবিযা। তবে দেরি করিস না।

যা করবি, কর, কিন্তু ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করে। বুঝলি ?'

'আচ্ছা আম্মা'। বলে রুমী বেরিয়ে গেল।

আমি খবর কাগজের দিকে চোখ নামালাম। ঢাকায় যতগুলো ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক দল আছে, সবাই আজ মিটিং ডেকেছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে এগারোটায় বটতলায়, তিনটেয় পল্টন ময়দানে। ন্যাপ এগারোটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে, বিকেলে পল্টনে। ন্যাপের কর্মসূচীর সঙ্গে সমর্থনে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, কৃষক সমিতি। বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে—বিকেল সাড়ে তিনটেয়। নবগঠিত ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের সভাও ঐ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণেই—বিকেল চারটেয়।

সব দলই মিটিং শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে পূর্ব পাকিস্তানে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়েছে।

তিনটের সময় রুমী, জামী, শরীফ, সুবহান—সবাই চলল পল্টন ময়দানের দিকে। রিকশা করে গেল। গাড়ি নিল না। অত ভিড়ে গাড়ি নিয়ে আরামের চেয়ে ঝামেলাই বেশি। কিটি জিজ্ঞেস করল, সে মিটিংয়ে যেতে পারে কি না। আমি সকালের কথা ভেবে একটু ইতস্তত করে বললাম, 'তোমার না যাওয়াই ভাল। ভিড়ের মধ্যে কখন না জানি চ্যাপ্টা হয়ে যাও। দেখ না, আমি যাচ্ছি না।' কিটি বুদ্ধিমতী। আসল কথাটা বুঝে মুখ কালো করে নিজের ঘরে চলে গেল।

বারেকও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা ঘুম থেকে উঠবেন চারটেয়, তাঁকে ওঠানো, মুখ ধোয়ানো—আমি যেতে দিলাম না। তাছাড়া আমার একটু মায়ের বাসায় যাওয়া দরকার। সকালে হেঁটে পারব না বলে যাই নি। দুটোর পর রিকশা চলছে।

সাড়ে চারটেয় বাবাকে চা-নাশতা খাইয়ে তাঁর সাথে খানিক কথা বলে বারেককে কাছে বসিয়ে রেখে আমি গেলাম মা'র বাসায়—ধানমন্ডি ছয় নম্বর রাস্তায়।

৩ মার্চ বুধবার ১৯৭১

কালরাতে একদম ঘুম হয় নি। রাত আটটায় হঠাৎ কারফিউ। সারাদিন ধরে যত মিটিং আর মিটিং-শেষের লাঠিসোঁটা-কাঠ-রড নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল, সন্ধের পরেও তার বিরাম ছিল না। আরো বেরিয়েছিল মশাল মিছিল। রেডিওতে কারফিউয়ের ঘোষণা আমরা শুনি নি। তাই বুঝি নি কারফিউ ঘোষণার প্রতিবাদেই বেশি বেশি শ্লোগান। ভেবেছি সারাদিনের

জের ওটা। কিন্তু হঠাৎ সাইরেনের বিকট আওয়াজে চমকে উঠেছি। কি ব্যাপার ? কি ব্যাপার? একে-ওকে ফোন করে জানতে পারলাম ওটা কারফিউ জারির সাইরেন।

রাত এগারোটার দিকে মাইকেও কারফিউ জারির ঘোষণা দূর থেকে কানে এল। শব্দ শুনে মনে হল, বলাকা নিউ মার্কেটের রাস্তায় এবং আমাদের বাড়ির দক্ষিণদিকে ইকবাল হলের সামনের রাস্তায়। তার পরপরই বহু কণ্ঠের শ্লোগান আরো জোরে শোনা যেতে লাগল। তার মানে কারফিউ অগ্রাহ্য করে মিছিল আর শ্লোগান। কেমন যেন অস্থির লাগতে লাগল। ভাবলাম, কয়েক জায়গায় ফোন করি অবস্থা জানবার জন্য—গুলশানে রেবাকে, মদনমোহন বসাক রোডে মনোয়ারাকে আর ইন্দিরা রোডে কামালকে।

রেবা বলল, 'এখানে রাস্তায় কোন মিছিল নেই; কিন্তু দূর থেকে শ্লোগানের শব্দ পাচ্ছি, আমাদের পেছন দিকটাতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া তো।

মনোয়ারা আমার ফোন পেয়ে কেঁদে ফেলল, 'কি যে হচ্ছে আপা! কেউ কারফিউ মানছে না, দলে দলে লোক রাস্তায় নেমে গেছে, ব্যারিকেড বানাচ্ছে, শ্লোগান দিচ্ছে। পুলিশও গুলি করছে। গুলি খেয়ে লোকে আরো ক্ষেপে উঠছে, দ্বিগুণ জোরে শ্লোগান দিচ্ছে। আমার ভাইটাও ওর মধ্যে আছে। জানি না বেঁচে আছে, না গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেছে। কি হবে আপা ?

মনোয়ারার কান্না শুনে মনটা বিকল হয়ে গেল। আর কাউকে ফোন করতে ইচ্ছে হল না। সারারাতই কানে এল শ্লোগানের সম্মিলিত গর্জন।

আজ সকালে খবর কাগজে গত রাতের মিছিল ও গুলির খবর বিস্তারিত পড়লাম। ষ্টেডিয়াম, নবাবপুর, টয়েনবী সার্কুলার রোড, ভজহরি সাহা স্ট্রিট, গ্রীন রোড, কাঁঠালবাগান, কলাবাগান, নিউ মার্কেট, ফার্মগেট—ঢাকার প্রায় সব এলাকাকেই কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে, বহুলোক মারা গেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

কাগজে আরেকটা খবর দেখলাম—বক্স করে দেওয়া হয়েছে :

১১০ নম্বর সামরিক আদেশ জারি।

'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মোঃ ইয়াকুব খান গতরাতে এখানে ১১০ নম্বর সামরিক আদেশবলে পত্রপত্রিকাসমূহে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছেন।

আদেশ লংঘনে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড।

খবরগুলো পড়ছি আর বুকের ভেতর কেমন যেন দম আটকানো ভাব হচ্ছে। ভাবলাম মনোয়ারাকে ফোন করি—খবর নিই ওর ভাইটা কেমন আছে। বাড়ি ফিরেছে কি না। কিন্তু ফোনের কাছে গিয়েও ফোন তুলতে পারলাম না।

রুমীকে নিয়ে আমার হয়েছে মহা উদ্বেগ। সারাদিন টো-টো করে সারা শহর দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কখন যে কি হয়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাসায় ফিস্ট লাগাতে বলছি, আগে সবসময় লুফে নিয়েছে, এখন নাকি সময় নেই।

আজকেও প্রায় সারাদিনই মিটিং-মিছিল চলছে। আগের রাতে গুলিতে নিহত আটটি

লাশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল করে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরেছে, মিছিল শেষে শহীদ মিনারে লাশ রেখে সকলে সমস্বরে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আদায়ের শপথ নিয়েছে।

বিকেলে পল্টন ময়দানের জনসভাতেও এই লাশগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বিশাল জনসমুদ্র শহীদদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করার শপথ নিয়েছে। সভায় শেখ মুজিব সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। বলেছেন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বাঙালি জাতি একপয়সাও ট্যাক্স-খাজনা দেবে না। তিনি সরকারকে বলেছেন সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে আর বাঙালি জনগণকে বলেছেন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে অহিংস অসহযোগিতা চালিয়ে যেতে।

সন্ধ্যার পর রুমী বাড়ি ফিরলে তার মুখে এসব শুনলাম। আরো শুনলাম এক নতুন পতাকার কথা। গতকালই নাকি বটতলায় ছাত্রদের জনসভায় এ পতাকা প্রথম দেখানো হয়েছিল। আজ পল্টনের জনসভায় শেখের উপস্থিতিতে প্রথমে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটা গাওয়া হল, তারপর স্বাধীন বাংলার এই নতুন পতাকা উত্তোলন করা হল।

আমি শিহরিত হয়ে বললাম, 'স্বাধীন বাংলার পতাকা? বলিস কি রে? কেমন দেখতে?

'দাঁড়াও, এঁকে দেখাই।' বলে একখণ্ড কাগজ ও কয়েকটা রঙিন পেনসিল এনে রুমী স্বাধীন বাংলার পতাকা আঁকতে বসল : সবুজের ওপর টকটকে লাল গোলাকার সূর্য, তার মধ্যে হলুদ রঙে পূর্ব বাংলার ম্যাপ।

আমি বললাম, 'এ ক'দিন তো স্বাধিকারের কথাই শুনছি, নির্বাচিত জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাই শুনছি, এর মধ্যে স্বাধীন বাংলার কথা কখন উঠল?'

'তুমি কোন খবর রাখো না আম্মা। স্বাধীন বাংলার দাবির কথা তো অনেক অনেক পুরনো ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে বহুদিন থেকেই গুমরাচ্ছিল। গত বছর নভেম্বরের সাইক্লোনের পরে তা ফেটে পড়েছে। তোমার মনে নেই মওলানা ভাসানী ১৮ নভেম্বর দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যেতে চাইলে তাঁর জাহাজ আটকে দেয়া হয়? সরকার অবশ্য পরে তাঁকে যেতে দেয় কিন্তু এ নিয়ে কি হৈচৈটা হয়, কাগজে পড়নি? তারপরেই তো, ৪ ডিসেম্বরের সেই যে মিটিং ন্যাপ, জাতীয় লীগ আরো কি কি দল যেন একত্রে মিটিং করল, ভাসানী সেখানেই পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানান। তারপর এখন আওয়ামী লীগের উগ্রজাতীয়তাবাদী সেকশনের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলার দাবি উঠেছে। চার খলিফা খুব চাপ দিচ্ছে শেখকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার জন্য।'

'চার খলিফা?'

'জান না বুঝি, আ. স. ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন আর নূরে আলম সিদ্দিকী—এই চার ছাত্রনেতাকে আমরা সবাই চার খলিফা বলে ডাকি। শাহজাহান সিরাজই তো আজ পল্টন সভায় পতাকাটা তুলেছে।

'শেখ কি বললেন?'

'কিছুই বললেন না। তবে খুব যে খুশিও হন নি, মুখ দেখে বোঝা গেল।'

'তাতো হবেনই না। এই মুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়াটা ভীষণ রিস্কি ব্যাপার না?'

'রিস্কি নিশ্চয়। কিন্তু আম্মা, ঘটনার একটা নিজস্ব গতি আছে না ? জলপ্রপাতের মত। উঁচু পাহাড় থেকে যখন গড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে রুখতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই। আমাদের দেশের জনতা এখন ঐ জলপ্রপাতের মত একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে অত্যন্ত তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে, একে আর বোধ হয় রোখা যাবে না।'

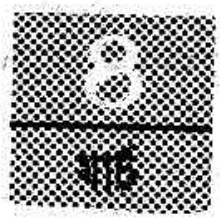

৪ঠা বৃহস্পতিবার ১৯৭১

গতকাল রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্ষুব্ধ জনতা আবার কারফিউ লংঘন করে মিছিল বের করেছে, গগনবিদারী শ্লোগান দিয়ে রাজপথ, জনপদ প্রকম্পিত করেছে এবং অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গুলি খেয়ে কালো পিচের রাস্তা রাঙা করেছে।

আজো ছ'টা–দুটো হরতাল।

গত তিনদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মিটিং, মিছিল করে করে রুমী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে বাড়িতেই আছে। দেখে আমার প্রাণে শান্তি। চিংকু এসেছে। দু'জনে কথা বলছে খাবার টেবিলে বসে। খাবার টেবিলটাই রুমীর পছন্দ আড্ডা দেবার জন্য। বলে বলেও ওকে বসার ঘরের সোফায় বসানো যায় না।

কয়েক মাস আগে ওয়েটিং ফর গোডোতে অভিনয় করে চিংকু খুব নাম করেছে। হোটেল ইন্টারকনের সাউথ বলরুমে নাটকটা অভিনীত হয়েছিল।

মিলিটারির গুলিতে নিহত শহীদদের জন্য আজ গায়েবানা জানাজা বায়তুল মোকাররমে। তারপর শোক মিছিল।

চিংকু বারোটার দিকে চলে গেল। রুমী আর শরীফ গোসল সেরে হালকা স্যান্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ সারল। হেঁটে হেঁটে বায়তুল মোকাররমে যাবে, তাই এই রকম আধপেটা খাওয়া।

বিকেলে রিকশা নিয়ে আমি আর জামী বেরোলাম মালিবাগের মোড়ে ট্রাফিক আইল্যান্ডে ফারুক ইকবালের কবর দেখতে। দুই তারিখে বিকেলে রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছিল ফারুক ইকবাল অন্য ছাত্রদের সঙ্গে। সেই সময় মিলিটারি পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সে। ক্রুদ্ধ ছাত্র–জনতা এই মোড়ের ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের ওপরই তাকে কবর দিয়েছে। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড আছে বলেই গাড়ি নেই নি। একেকটা ব্যারিকেডের সামনে এসে রিকশা ছেড়ে দিই। ব্যারিকেডের পাশ দিয়ে হাঁটা রাস্তায় ওপাশে গিয়ে আরেকটা রিকশা নিই। এদিকটার কয়েকটা ব্যারিকেড ভারি চমৎকার জিনিস দিয়ে করা হয়েছে—রেলগাড়ির বগি। জামী বলল, দুই তারিখের বিকেলে মালিবাগ লেভেল ক্রসিংয়ে

একটা রেলগাড়ি আটক করে সবাই। তারপর একেকটা বগি টেনে টেনে ব্যারিকেড দিয়েছে তিন-চার জায়গায়।

ফারুকের কবরের কাছে এসে দেখি কবরটা ঘিরে দড়ির রেলিং। আগরবাতি জ্বলছে। চারপাশে অনেক লোক। সন্ধে হয়ে আসছে, কয়েকজন লোক মোমবাতি জ্বেলে দিল। দু'জন মৌলবী সাহেব কোরান শরীফ পড়ছিলেন, একজন লোক দুটো বড় সাইজের মোমবাতি জ্বেলে ওঁদের সামনে বসিয়ে দিল।

আজ রাতে কারফিউ নেই।

শুক্রবার ১৯৭১

আজো ছ'টা-দুটো হরতাল।

শেখ মুজিব হরতালের দিনগুলোতে বেতন পাওয়ার সুবিধের জন্য এবং অতি জরুরী কাজকর্ম চালানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি সব অফিস দুপুর আড়াইটে থেকে চারটে পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রেশন দোকানও ঐ একই সময়ে খোলা।

ব্যাঙ্কও তাই। আড়াইটে-চারটের মধ্যে টাকা তোলা যাবে। তবে দেড় হাজার টাকার বেশি নয়। বিকেলে ব্যাঙ্ক খোলা—ভাবতে মজাই লাগছে। শেখের একেকটা নির্দেশে সব কেমন ওলটপালট খেয়ে যাচ্ছে।

জরুরী সার্ভিস হিসেবে হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তারের গাড়ি, সংবাদপত্র ও তাদের গাড়ি, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, দমকল, মেথর ও আবর্জনা ফেলা ট্রাক—এগুলোকে হরতাল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজ মসজিদ ও মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা। গোসল সেরে পৌনে একটার সময় শরীফ, রুমী, জামী, সুবহান—সবাই পাড়ার এরোপ্লেন মসজিদে গেল।

তারপর আড়াইটের সময় খেয়ে-দেয়ে শরীফ অফিসে রওনা দিল।

আজ বিকেল চারটের সময় লেখক সংঘের মিটিং তোপখানা রোডে। মিটিং শেষে সেখান থেকে মিছিল করে শহীদ মিনারে আসা হবে। আমি সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা নাগাদ সোজা শহীদ মিনারেই যাব। হাঁটুতে বাতের জন্য বেশি হাঁটতে পারি না।

ক'দিন হট্টগোলে কিটিকে বাংলা পড়ানো হয় নি। আজ শরীফ চলে যাবার পর কিটিকে নিয়ে বসলাম। কিটি আমেরিকান মেয়ে—একটা স্কলারশিপ নিয়ে এদেশে এসেছে ডিসেম্বরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে মুনীর চৌধুরীর আণ্ডারে 'সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার মান নির্ধারণ' বিষয়ে গবেষণা করার জন্য। ন'টা ভাষা জানে। বাংলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলতে পারে। তাড়াতাড়ি বাংলা শেখার জন্য কোন বাঙালি পরিবারে বাস করার

ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল কিটি। তাই মুনীর স্যার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ওর জন্য একটা বাঙালি পরিবার খুঁজে দিতে। তিন-চার জায়গায় চেষ্টা করে না পেয়ে শেষে নিজের বাড়িতেই রেখেছি ওকে।

সপ্তাহে তিনদিন করে বাংলা পড়াই কিটিকে। বাড়ির অন্য সবার সঙ্গে সর্বক্ষণ বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে সে। আজ কিন্তু ওর বাংলা পড়ার বা বাংলায় কথা বলার কোন চেষ্টা দেখলাম না। সরাসরি ইংরেজিতে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা আম্মা, আমি যখন প্রথম আসি, তখন রাস্তায় আমাকে দেখলে লোকে উৎসুক হয়ে উঠত, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইত। আর এখন কেন দেখলে বিরক্ত হয়? রেগে রেগে কি যেন বলে।'

আমি বিপদে পড়লাম। মেয়েটি খুব আবেগপ্রবণ এবং মেজাজীও। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে তোমাকে এদেশের গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের ইতিহাস ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা ভালো করে বোঝাতে হবে।'

মিটিংয়ে আর যাওয়া হল না। কিটিকে বোঝাতে বোঝাতে সন্ধে কাবার হয়ে গেল।

শনিবার ১৯৭১

ছ'টা-দুটো হরতাল চলছেই।

শরীফ আর রুমী আজ সকালে হাঁটতে হাঁটতে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে এল। আমি আর জামী বাদ গেলাম যথাক্রমে অ্যানিমিক ও ছোট বলে।

গতকালকার আলোচনার পর থেকে কিটি কেমন যেন চুপ মেরে গেছে।

শরীফরাও রক্ত দিতে যাবার আগে, সে যেরকম মুখ করে ওদের দিকে তাকিয়েছিল, তাতে মনে হল, সেও বোধহয় রক্ত দিতে যেতে চাইছে। কিন্তু কপাল ভাল, শেষ পর্যন্ত কিটি মুখ খুলল না।

আমার বেশ খারাপ লাগছে কিটির কথা ভেবে। এখানে আসার দিন পনের পর থেকেই ও আমাকে আম্মা বলা শুরু করেছে। মাস দেড়েক পর থেকে শরীফকেও আব্বা বলছে। ও আমাদের পরিবারে মিশে যেতে চায়, সব ব্যাপারে অংশ নিতে চায়। কিন্তু ওর সোনালি চুল, নীল চোখ রাস্তায় লোকজনের মুখে ভ্রূকুটি এনে দেয়। পাড়ার লোকেরাও এখন আর ভাল চোখে দেখে না ওকে। বাসায় মেহমান এসেও ওকে দেখে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে যায়। আমরা যখন সকলে মিলে গলা ফাটিয়ে তর্ক, আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠি, তখন কিটি এসে দাঁড়ালে আমরা থমকে যাই। মাতৃভাষায় যত কথা কলকল করে বলতে পারি, ইংরেজিতে তত স্রোত আসে না। ফলে আলাপ হোঁচট খায়। তাতে ও সন্দেহ করে, ওকে

দেখে আমরা বুঝি কথা ছাপাচ্ছি! আমরা বাংলায় আলাপ চালিয়ে রাখলে সব কথা বুঝতে পারে না। তখন উল্টো মাইণ্ড করে। ভারি এক ফাটা বাঁশের মধ্যে পড়েছি যেন!

আজ দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। শরীফ সাড়ে বারোটার মধ্যেই গোসল সেরে রেডি—প্রেসিডেন্ট কি বলেন, তা শোনার জন্য সকলেই চনমন করছি। এক তারিখের ঘোষণায় তো লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গেছে, এখন আবার কি বলেন—তা নিয়ে আমাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। আগামীকাল রেসকোর্সে গণজমায়েতে শেখ কি বলবেন, তা নিয়েও লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। এক তারিখে হোটেল পূর্বাণীতে তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচীর ঘোষণা তিনি সাত তারিখে দেবেন। কিন্তু এ ক'দিনে ঘটনা তো অন্য খাতে বইছে। এত মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ, কারফিউ ভঙ্গ, গুলিতে শয়ে শয়ে লোক নিহত-এর প্রেক্ষিতে শেখ আগামীকাল কি ঘোষণা দেবেন ? কেউ বলছে, উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, দূর তা কি করে হবে ? উনি নির্বাচনে জিতে গণপ্রতিনিধি, মেজরিটি পার্টির লিডার, উনি দাবির জোরে সরকার গঠন করবেন, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করবেন। এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়বে। কেউ বলছে, আগামীকালের মিটিংয়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে ইয়াহিয়া আজ ভাষণ দিচ্ছে।

ভাষণ শুনে সবাই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। আমি হেসে শরীফকে বললাম, 'তুমি কি আশা করেছিলে? ইয়াহিয়া 'এসো বঁধূ আধ-আঁচরে বসো' বলে মুজিবকে ডেকে সরকার গঠন করতে বলবে ?'

'না, অতটা আশা না করলেও ওরকম কর্কশ গলার ধমক-ধামকও আশা করি নি। যত দোষ নন্দঘোষ বলে উনি যেভাবে আমাদের গালাগালি করলেন, সেটা মোটেই আমাদের প্রাপ্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য উনিই তো দায়ী।'

'যাই বলো, ভয় পেয়েছে কিন্তু। দেখলে না ২৫ মার্চ অধিবেশন বসবার ঘোষণা দিল?'

রুমী চটা গলায় বলে উঠল, 'আর সামরিক বাহিনী দিয়ে আমাদের শায়েস্তা করার হুমকি দিল যে ? সেটা কি ?'

এইসব কচাকচি করতে করতে দুপুরের খাওয়া শেষ হল। শরীফ ও রুমীকে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে দেখে বললাম,

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'অফিসে।'

'অফিসে ? আজ না শনিবার, হাফ ?'

রুমী হেসে উঠে বলল, 'আম্মা ভুলে গেছ, এখন না বিকেলে অফিস- কাচারি চলছে ?'

আমি বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'তাতে কি ? হাফের দিন হাফ থাকবে না ?'

'নিশ্চয় থাকবে। হাফ ছুটিটা সকালেই হয়ে গেছে, এখন হাফ অফিস। দেখছ না, এখন উলট-পুরাণের যুগ চলছে।'

'তাই বটে। কিন্তু তুই কোথায় যাচ্ছিস ?'

'আমি ? আমিও অফিসে যাচ্ছি। ও আম্মা, তুমি কি ভুলে গেছ আমি আব্বুর অফিসে ড্রয়িং করতে যাই ? তাছাড়া এখন যে বেবী চাচার সঙ্গে কাজ করি ?'

ভুলেই গেছিলাম বটে ! রুমী গত বছর আই.এস.সি পরীক্ষা দেবার পর থেকে শরীফের অফিসে টুকটাক ড্রয়িংয়ের কাজ করে। রেজাল্ট বেরোবার পর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে গত বছর অক্টোবরে; কিন্তু তখনিই কলেজ থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল ক্লাস শুরু হবে একাত্তরের মার্চ থেকে। তাই বসে না থেকে শরীফের অফিসের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে। সেটাও তার সবসময় করতে ভাল লাগে না। তাই বিভাগীয় প্রধানের বিশেষ অনুমতি নিয়ে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিকস বিভাগে ক্লাসও করে। এখন তো মার্চে এই তোলপাড় ব্যাপার। পড়াশোনা এতদিন শিকেয় তোলা ছিল, এবার টংয়ে উঠল।

বাংলা একাডেমিতে আজ শিল্পীদের জরুরী সভা আড়াইটেয়। যদিও আমি শিল্পী বা সাহিত্যিক নই, কিন্তু ঢাকায় সেই ১৯৪৯ সাল থেকে আছি বলে বেশির ভাগ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিচয় ও আলাপ আছে। তাই শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক সভা, সমিতি, সেমিনার, আন্দোলন ইত্যাদিতে দর্শক ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় সবসময়ই গিয়ে থাকি।

কিন্তু আজও বাধা পড়ল। বাবাকে ওঠানোর ভার জামীর ওপর দিয়ে তিনটের দিকে বেরোব ভেবেছিলাম। কিন্তু বাবা হঠাৎ পৌনে তিনটেয় জেগে ডাক দিলেন, 'মাগো, একটু শোন তো।'

কি ব্যাপার ?

'মনে হচ্ছে খাটটা দুলছে।'

বুঝলাম। ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ব্লাড প্রেসার বাড়লেই ওর মনে হয় খাট, দেয়াল, ছাদ সব দুলছে। রুমীর ওপর রাগ হল। কাল রাতে রুমী অনেকক্ষণ ধরে বাবাকে দেশের পরিস্থিতি বুঝিয়েছে। অন্ধ মানুষ, বয়স প্রায় নব্বই, হাই ব্লাড প্রেসারের জন্য সবসময় ধরে ধরে সব করাতে হয়। তার ওপর সামান্য মানসিক চাঞ্চল্য হলেই আর রক্ষা নেই। প্রেসার একেবারে দশতলায় উঠে বসে থাকে। তাঁকে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের এই মরণপণ আন্দোলনের সাতকাহন না শোনালেই নয় ? প্রতিবেশী ডাক্তার এ. কে. খানও নেই ঢাকায় রাজশাহীতে পোস্টেড। তাঁর অবর্তমানে কখনো ডাঃ নুরুল ইসলাম, কখনো ডাঃ রব দেখেন বাবাকে। কিন্তু এখন ওঁদের বিশ্রামের সময়। পাঁচটার আগে ডাকা ঠিক হবে না। তাই ফোন করে শরীফকেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতে বললাম।

পাঁচটার পর ডাঃ নুরুল ইসলামকে ফোন করলাম। উনি বাড়ি নেই। সৌভাগ্যবশত ডাঃ রবকে পেয়ে গেলাম। উনি বললেন, 'এখন তো ভাই আমার গাড়িটা নেই। রুমীকে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ?'

অতীতে রুমী বহুবার ওঁকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছে।

রুমীকে গাড়ি নিয়ে যাবার জন্য বলতেই সে বলল, এখন তো ওই রাস্তায় গাড়ি নেয়া

যাবে না। এখন যে ওই রাস্তা দিয়ে মিছিল যাবে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি।

তাইতো। ডাঃ রবের বাড়ি মিরপুরে মেইন রোডের ওপর। গত ক'দিন ধরে রোজই সন্ধ্যায় সব মিছিল ওই রাস্তা দিয়ে গিয়ে শেষ হয় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে।

রবিবার ১৯৭১

আজ বিকেলে রমনা রেসের মাঠে গণজমায়েত। গত ক'দিন থেকে শহরের সবখানে, সবার মধ্যে এই জনসভা নিয়ে তুমুল জল্পনা-কল্পনা, বাকবিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক। সবাই উত্তেজনায়, আগ্রহে, উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় টগবগ করছে। আমি যদিও মিটিংয়ে যাব না, বাসায় বসে রেডিওতে বক্তৃতার রিলে শুনব, তবু আমাকেও এই উত্তেজনার জ্বরে ধরেছে।

এর মধ্যে সুবহান আমাকে জ্বালিয়ে মারল। আজ তাড়াতাড়ি রান্না সারতে বলেছিলাম। শরীফ বলেছে বারোটার মধ্যে খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবে। ঠিক দেড়টাতে রওনা দেবে, নইলে কাছাকাছি দাঁড়াবারও জায়গা পাবে না। আর সুবহান হতচ্ছাড়াটা এগারোটার সময় গোশত পুড়িয়ে ফেলল। বারেককে দিয়েছিলাম রুমী-জামীদের সার্ট ইস্ত্রি করতে। সুবহান চুলোয় গোশত রেখে বারেকের সঙ্গে ইস্ত্রি করাতে মেতেছে। তিনিও আজ শেখের বক্তৃতা শুনতে যাবেন, তাই তাঁর নিজের প্যান্ট-সার্ট ইস্ত্রির তদারকিতে যখন মগ্ন, তখন গোশত গেছে পুড়ে। কি যে করি ওকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি ডিমের অমলেট করে ডাল-তাজিসহ ভাত দিলাম শরীফদের।

এতবড় কাণ্ড করে, এত বকা খেয়েও সুবহানের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। রান্নাঘরে সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে প্যান্ট-সার্ট পরে তিনি শরীফদের সঙ্গে চললেন শেখের বক্তৃতা শুনতে।

আজ বারেকও গেছে ওদের সঙ্গে। এর আগে কোন মিটিংয়ে যেতে দিই নি ওকে। আজকে না দিলে বড় অন্যায় হবে।

কিটির ঘরে গিয়ে ওর বারো ব্যান্ডের দামী রেডিওটা চেয়ে নিয়ে উপরে গেলাম। ওকেও আসতে বললাম আমার ঘরে। বাবা দুপুরের খাওয়ার পরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। আমি রেডিওটা নিয়ে আয়েশ করে বিছানায় শুলাম। একটু পরে কিটিও এল। রেডিও অন করে রেখেই দু'জনে শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগলাম।

রেডিওতে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটা শোনা গেল। আমরা কথা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। ওমা! তারপর আর শব্দ নেই। কি ব্যাপার ?

শব্দ নেই তো নেই-ই। কারেন্ট গেল ? বাতির সুইচ টিপে দেখলাম কারেন্ট আছে। রেডিওটা খারাপ হল ? নব ঘুরিয়ে দেখলাম অন্য স্টেশন ধরছে। তাহলে ?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, 'চল ছাদে যাই তো।'

দু'জনে ছাদে গেলাম। পুবদিকে সোজাসুজি মাপলে মাত্র আধ মাইল দূরে রেসের ময়দান। নানা রকম শ্লোগানের অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে। আকাশে চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার কেন ? কি ব্যাপার ?

ব্যাপার সব জানা গেল শরীফরা মিটিং থেকে ফেরার পর।

কলিং বেলের শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই রুমী দুই হাত তুলে নাটকীয় ভঙ্গিতে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল। দেখি, ফখরুদ্দিনও এসেছেন। ফখরুদ্দিন—সংক্ষেপে ফকির, শরীফের স্কুল জীবনের বন্ধু। তাঁর পেশা ব্যবসা আর নেশা রাজনীতি, যদিও কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য তিনি নন। তবে রাজনৈতিক অঙ্গনের খবরাখবরে তাঁর চেয়ে ওয়াকিবহাল আমাদের জানার মধ্যে আর নেই।

সোফায় ধপ করে বসে পড়ে ফকির বললেন, 'ভাবী, চা খাওয়ান। একসঙ্গে তিন কাপ—গলা শুকিয়ে কাঠ।'

'চেহারাও তো শুকিয়ে কাঠি। কি করে বেড়ান আজকাল ? খান না নাকি ?'

শরীফ মুচকি হেসে বলল, 'নেতাদের লেজ ধরে দৌড়োদৌড়ির চোটে ওর নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত নেই।' সুযোগ পেয়েই শরীফ ফকিরের পেছনে লাগে। আমি সুবহানকে চায়ের হুকুম দিয়ে সোফায় বসলাম, 'ওসব লেগ-পুলিং এখন রাখ। মিটিংয়ের কথা বল। রেডিও বন্ধ হয়ে রয়েছে কেন ? আকাশে হেলিকপ্টার দেখলাম যেন।'

রুমী বলল, 'হেলিকপ্টার তো পয়লা তারিখের পল্টন জনসভাতেও ছিল। ওরা বোধহয় গার্ড অব অনার দেওয়ার রেওয়াজ করেছে।'

সবাই হেসে উঠল। কিটি রেডিও হাতে গুটিগুটি এসে দাঁড়াল, মৃদুকণ্ঠে বলল, 'রেডিও এখনো চুপ।'

আমি বললাম, 'কিটি, এখানে এসে বস। আজ তোমার বাংলা বোঝার পরীক্ষা নেব। এখানে বসে আমাদের বাংলায় কথাবার্তা শোন, তারপর পুরোটা বলতে হবে। রেডিওটা খোলাই থাক।'

কিটি হেসে সহজ হল, সোফায় এসে বসল। আমরা বাঁচলাম—এখন কলকল করে মাতৃভাষায় আলাপ না করলে প্রাণে শান্তি হবে না।

রেসকোর্স মাঠের জনসভায় লোক হয়েছিল প্রায় তিরিশ লাখের মত। কত দূর-দূরান্তর থেকে যে লোক এসেছিল মিছিল করে, লাঠি আর রড ঘাড়ে করে—তার আর লেখাজোখা নেই। টঙ্গী, জয়দেবপুর, ডেমরা—এসব জায়গা থেকে তো বটেই, চব্বিশ ঘন্টার পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে ঘোড়াশাল থেকেও বিরাট মিছিল এসেছিল গামছায় চিঁড়ে-গুড় বেঁধে। অন্ধ ছেলেদের মিছিল করে মিটিংয়ে যাওয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। বহু মহিলা, ছাত্রী মিছিল করে মাঠে গিয়েছিল শেখের বক্তৃতা শুনতে।

'কিন্তু শেখ নিরাশ করেছেন সবাইকে।' রুমীর একথায় সবচেয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন ফকির, 'তোমার মাথা গরম, চ্যাংড়া ছেলেরা কি যে বল না—ভেবেচিন্তে—শেখ যা

করেছেন, একদম ঠিক করেছেন।'

সেই পুরনো বাকবিতণ্ডা—যা গত কয়েকদিন ধরে সর্বত্রই শুনছি। একদল চায় শেখ স্বাধীনতার ঘোষণা দিন—আরেকদল বলছে তাহলে সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হবে।

রুমী তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলাতেই দৃঢ়তা এনে প্রতিবাদ করল, 'আপনারা দেয়ালের লিখন পড়তে অপারগ। দেখেন নি আজ মিটিংয়ে কত লাখ লোক স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে নিয়ে এসেছিল ? জনগণ এখন স্বাধীনতাই চায়, এটা তাদের প্রাণের কথা। নইলে মাত্র এই ছ'দিনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবাই সবখানে স্বাধীন বাংলার ঐ রকম ম্যাপ লাগানো পতাকা সেলাই করার মত একটা জটিল কাজ, অন্যসব কাজ ফেলে, করে, সেটা আবার বাতাসে নাড়াতে নাড়াতে প্রকাশ্য দিবালোকে মিছিল করে যায় ?'

তর্কের গন্ধ পেলে তর্কবাগীশ ফকির সর্বদাই চাঙ্গা, তিনি বললেন, 'তুমিও দেখছি চার খলিফার দলের।'

রুমী বলল, 'আমি কোন দলভুক্ত নই, কোন রাজনৈতিক দলের শ্লোগান বয়ে বেড়াই না। কিন্তু আমি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, মান-অপমান জ্ঞানসম্পন্ন একজন সচেতন মানুষ। আমার মনে হচ্ছে শেখ আজ অনায়াসে ঢাকা দখল করার মস্ত সুযোগ হারালেন।'

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'এই সুদূরপ্রসারী তর্ক শুরু করার আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই ছোট্ট একটা খবর। শেখের বক্তৃতা রিলে করা হবে বলে সারাদিন রেডিওতে অ্যানাউন্স করেও শেষ পর্যন্ত রিলে করা হল না কেন ? কেনই-বা রেডিও একদম ডেডস্টপ ? এইটে শোনার পর আমি রান্নাঘরে চলে যাব। তখন তোমরা মনের সুখে সারারাত কচকচ কোরো।'

'শেখের বক্তৃতা রিলে করার জন্য বেতার-কর্মীরা তো তৈরিই ছিল। শেষ মুহূর্তে মার্শাল ল' অথরিটি বক্তৃতা রিলে করতে দিল না। ব্যস, অমনি রেডিও স্টেশনের সমস্ত কর্মীরা হাত গুটিয়ে বসল। শেখের বক্তৃতা রিলে করতে না দিলে অন্য কোন প্রোগ্রামই যাবে না। তাই রেডিও এরকম চুপ।'

জামী এতক্ষণ একটাও কথা বলে নি, এখন হঠাৎ বলে উঠল, 'জান মা, আজ বিকেলের প্লেনে টিক্কা খান ঢাকায় এসেছে গভর্নর হিসাবে।'

এক সপ্তাহ দুইবার গভর্নর বদল। এক তারিখে ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে বদলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে দেওয়া হয়েছিল, এখন আবার ছ'দিনের মাথায় তাকে সরিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে আন' হল। কি এর আলামত ?

আজ রাতে রেডিও আর গলাই খুলল না।

সোমবার ১৯৭১

গতকাল সন্ধ্যার পর রেডিও স্টেশনের লনে কারা যেন বোমা ছুঁড়েছে।

কাল রাতে রেডিও বন্ধ থাকার পর আজ সকাল থেকে আবার চালু হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা প্রচারিত হল।

শরীফের খালাতো ভাই আনোয়ার সকালে ফোন করে জানাল, গত পরশু তার মেজ মেয়ে ইমন আগুনে পুড়ে গেছে। তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনতলা নিউ কেবিনে রাখা হয়েছে।

বিকেলে মেডিক্যালে গেলাম ইমনকে দেখতে। কপাল ভালো খুব বেশি পোড়ে নি। মুখটা বেঁচে গেছে। কেবিনে টুনটুনি আপা, ছবি আপা, ডলি আপার খালা এবং আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হল। এরা সবাই ইমনকে দেখতে এসেছেন। কিন্তু ইমনের প্রতি মিনিট পাঁচেক মনোযোগ দেয়ার পরই সবাই মশগুল হয়ে গেলেন শেখের গতকালের বক্তৃতার আলোচনায়। তবে রক্ষে, এঁরা কেউ স্বাধীনতা-স্বাধিকারের তর্কের দিকে গেলেন না। এঁরা লোকমুখে এবং রেডিওতে শোনা বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত বক্তৃতা লোকজনকে কি রকম সম্মোহিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছে—সে কথাই বলে গেলেন।

আজ আশুরা। হোসেনী দালান থেকে মহরমের মিছিল বেরিয়ে এতক্ষণে আজিমপুর গোরস্থানের রাস্তায় গিয়ে উঠেছে মনে হয়। আজিমপুর কলোনির এক নম্বর বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে মহরমের মিছিল গোরস্থানে যায়, এই রাস্তার ওপরই মহরমের মেলা বসে। প্রতি বছর আমরা মেলায় যাই বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারা তাদের মনোমত খেলনা কেনে, আমরা বঁটি, দা, বেলুনপিঁড়ি ইত্যাদি গোরস্থালির জিনিস কিনি।

কিন্তু এবছর ছেলেদেরও মিছিল বা মেলা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই, আমাদের তো নেই-ই। গত এক সপ্তাহ ধরে বাংলার ঘরে ঘরেই কারবালার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কত মা ফাতেমার বুকের মানিক, কত বিবি সখিনার নওজোয়ান স্বামী পথে-প্রান্তরে গুলি খেয়ে ঢলে পড়ছে—বাংলার ঘরে ঘরে এখন প্রতিদিনই আশুরার হাহাকার, মর্সিয়ার মাতম। কিন্তু কবি যে বলেছেন, 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না', তাই বুঝি বাংলার দুর্দান্ত দামাল ছেলেরা 'ত্যাগ চাই' বলে ঘরের নিশ্চিন্ত আরাম ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়েছে। গত সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম থেকে এমন লম্বা মশাল মিছিল বেরিয়েছিল যে বলবার নয়। আমরা দেখি নি—রুমী, ফকির, শরীফ—এরা তর্কের কচকচির মধ্যে পড়ে রাত এগারোটা করে ফেলেছিল। খবরটা জানা গেল আমার বান্ধবী রোকেয়ার টেলিফোনে। ওদের বাড়ি ধানমণ্ডি আট নম্বর মেইন রোডের ওপর। ওদের বাড়ির সামনের মিরপুর রোড দিয়েই সব মিছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যায়। রোকেয়া বলল, 'জানিস, মশাল মিছিল দেখে আমারও রাস্তায় নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল।'

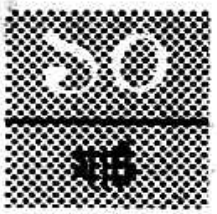

বুধবার ১৯৭১

স্বাধিকার-স্বাধীনতা নিয়ে চেয়ারে বসে বাক-বিতন্ডার লড়াই চলছেই। সাতদিন বাইরে বাইরে ঘুরে, রুমী এখন দেখি, ক'দিন বাড়িতেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খাবার টেবিল গুলজার করে রাখছে ঘন্টার পর ঘন্টা। এতে আমার আর সুবহানের খাটনি বেশি হয় বটে—দফায় দফায় চা-নাশতার সাপ্লাই দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আমার প্রাণটা থাকে ঠান্ডা। হৈহল্লা, বাড়িঘর লণ্ডভণ্ড—যা করছে করুক, অন্তত চোখের সামনে তো রয়েছে। রুমী বাইরে গেলেই আমার প্রাণটা যেন হাতে কাঁপতে থাকে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একটা গুলির ব্যবধান মাত্র, কখন আচমকা কোনদিক থেকে তীক্ষ্ণ শিসে ছুটে আসে, কে বলতে পারে !

'সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।' জামীর করার কিছু নেই। রুমীর চেয়ে সাড়ে তিন বছরের ছোট হওয়ার অপরাধে তার মিটিং-মিছিলে যাওয়ারও অনুমতি নেই। রুমীদের আলাপ-আলোচনায় সর্বক্ষণ তাল দেবার মত বয়স-বিদ্যা কিছুই এখনো হয় নি। তাছাড়া রুমীর বেশির ভাগ বন্ধু রুমীর চেয়ে বয়সে দু-তিন-চার বছরের বড়। পড়েও তার চেয়ে দু'তিন ক্লাস ওপরে। রুমীদের আলাপ-আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও-সে-তুং। এসবের মধ্যে জামী দাঁত ফোটাতে পারে না। কেবল চেগুয়েভারার কথা উঠলে সে লাফিয়ে এসে বসে।

জামীর বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র টাট্টুকেই দেখি বেশির ভাগ আসতে—যদিও সে থাকে সবচেয়ে দূরে—গুলশানে। অন্য বন্ধুদের পাত্তা নেই—নিশ্চয় তাদের মায়েরা বেরোতে দেয় না। টাট্টুর একটা সুবিধে আছে, তার বাবা-মা আমাদের পারিবারিক বন্ধু। কাজেই টাট্টু এ বাড়িতে আসবার আবদার ধরলে তার বাবা-মা, তাকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হন। এদিক থেকেও একই কাহিনী। জামী আবদার ধরলে আমরা তাকে গাড়ি করে গুলশানে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই। টাট্টু-জামীর ভাবখানা এই মিটিং-মিছিলে যখন যেতে দেবেই না, অন্তত দু'বন্ধুতে মেলামেশা করতে দাও!

ছেলে-ছোকরারা স্বাধীনতা-স্বাধিকারের তর্কে একমতে আসতে পারছে না, ওদিকে আশি বছরের বৃদ্ধ ভাসানী গতকালকার পল্টন ময়দান মিটিংয়ে স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করে বসে আছেন। গতকাল বিকেল তিনটেয় পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে যে জনসভা হয়, তাতে সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি বলেন : 'বর্তমান সরকার যদি ২৫ মার্চের মধ্যে আপসে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না দেয়, তাহলে '৫২ সালের মত মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একযোগে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম শুরু করব।'

ভাসানীর বক্তৃতার একটি কথা আমার মনে খুব দাগ কেটেছে। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার নায়ক হওয়া অনেক বেশি গৌরবের।'

মহাকবি মিল্টন-এর অমর মহাকাব্য 'প্যারাডাইজ লস্ট'-এর সেই বিখ্যাত পঙক্তি মনে পড়ল-ইট্ ইজ্ বেটার টু রেইন ইন হেল দ্যান সার্ভ ইন হেভ্ন।' স্বর্গে গোলামি করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অনেক ভাল।

ব্যাঙ্কে টাকা তোলার আবার নতুন সময় করা হয়েছে—নয়টা-বারোটা। এখন থেকে শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিতে থাকবেন।

শুক্রবার ১৯৭১

কিটিকে নিয়ে মহা ঝামেলায় পড়েছি। তার জন্য এই বুড়ো বয়সে নতুন করে সাধারণ জ্ঞানের বই পড়ে তথ্য যোগাড় করতে হচ্ছে। এত মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ দেখেও সে যেন মেনে নিতে পারছে না পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এই বিক্ষোভ ন্যায়সঙ্গত, তাদের স্বাধিকারের দাবি ন্যায়সঙ্গত। কিটি বলছে, তোমরা তো খালি মুখেই বলছ তোমরা বঞ্চিত, পশ্চিম পাকিস্তান তোমাদের প্রতি অন্যায় করছে, তোমাদের টাকা দিয়ে নিজেদের পেট ভরাচ্ছে। কিন্তু এ অভিযোগের সমর্থনে ফ্যাক্টস্ কই ? ফিগারস্ কই ? কোন্ কোন্ খাতে তোমরা বঞ্চিত শোষিত, তার স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাও।

শোনো কথা! শোষণ, বঞ্চনার পরিসংখ্যান আমি মুখস্থ করে রেখেছি নাকি ? কিন্তু কিটিকে তো আর বলতে পারি নে, আমার অত মনে নেই, তুমি বই-কাগজপত্র পড়ে নিজে জেনে নাও। সুতরাং আবার নতুন করে গত চব্বিশ বছরের অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ, অবিচারের পরিসংখ্যান ঘাঁটছি ! পাই-পয়সা ধরে হিসেব করে কিটিকে দেখিয়ে দেব—চাল, আটা, নুন, কাগজ, সোনা থেকে শুরু করে সব খাতে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শুষে ছিবড়ে করে দিচ্ছে। শেখের নির্বাচনী পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন' খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওটা কিটিকে দেখাতে পারলেই আমার কাজ বারো আনা হাসিল হয়। ওতে পাই-পয়সা ধরে হিসেব করে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে বৈষম্য ও শোষণের সমস্ত তথ্য কিন্তু কারো কাছে যদি এক কপি থেকে থাকে !

রবিবার ১৯৭১

বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ঢাকার কবি-সাহিত্যিকরা 'লেখক সংগ্রাম শিবির' নামে একটি কমিটি গঠন করেছেন। আহ্বায়ক : হাসান হাফিজুর রহমান। সদস্য : সিকান্দার আবু জাফর, আহমদ শরীফ, শওকত ওসমান, শামসুর রাহমান, বদরুদ্দিন উমর, রণেশ দাশগুপ্ত, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ব্রোকনুজ্জামান খান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, জহির রায়হান, আবদুল গনি হাজারী এবং আরো অনেকে।

কমিটি কয়েকদিন আগেই গঠিত হয়েছে, আজ বিকেল পাঁচটায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এর জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হল। আহমদ শরীফ স্যার সভাপতি।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে লেখকদের সংগ্রামী ভূমিকা সম্পর্কে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করলেন রণেশ দাশগুপ্ত, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, হাসান হাফিজুর রহমান, রাবেয়া খাতুন, আহমদ ছফা ও আরো কয়েকজন।

আমি সাহিত্যিকও নই, বক্তাও নই, আমি পেছনের দিকে চেয়ারে বসে বসে শুনলাম আর ভেতরে ভেতরে উদ্দীপ্ত হলাম। মিটিং শেষে সকলে মিছিল করে বেরোলেন শহীদ মিনারের উদ্দেশে। বাংলা একাডেমি থেকে শহীদ মিনার বেশিদূর নয়। আমার হাঁটুর ব্যথাটাও কয়েকদিন থেকে নেই। সাহস করে আমিও মিছিলে শামিল হলাম।

শিল্পীরাও পিছিয়ে নেই। মার্চের প্রথম থেকেই বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র—সব মাধ্যমের শিল্পীরাই অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে মিটিং, মিছিল, গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে আসছিলেন। এখন আবার বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা থেকে প্রতিনিধি নিয়ে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়েছে।

পরিষদের সভাপতি : আলী মনসুর। সম্পাদক : সৈয়দ আবদুল হাদী। কোষাধ্যক্ষ : লায়লা আর্জুমান্দ বানু। সদস্য : মোস্তফা জামান আব্বাসী, জাহেদুর রহিম, ফেরদৌসী রহমান, বশির আহমেদ, খান আতাউর রহমান, বারীন মজুমদার, আলতাফ মাহমুদ, গোলাম মোস্তফা, কামরুল হাসান, অজিত রায়, হাসান ইমাম, কামাল লোহানী, জি. এ. মান্নান, আবদুল আহাদ, সমর দাস, গহর জামিল, রাজ্জাক ও আরো অনেকে।

বেতার ও টিভি কেন্দ্রে মিলিটারি কেন মোতায়েন করা হয়েছে—এই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

১৫ মার্চ সোমবার ১৯৭১

খেতাব বর্জন শুরু হয়ে গেছে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর 'হেলালে ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী 'সিতারা-ই ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেছেন।

নাটোর হতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ডাঃ শেখ মোবারক হোসেন 'তমঘা-এ পাকিস্তান', ফরিদপুরের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শেখ মোশারফ হোসেন 'তমঘা-এ কায়েদে আযম' খেতাব বর্জন করেছেন।

দৈনিক পাকিস্তান সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনও তাঁর 'সিতারা-ই খিদমত' এবং 'সিতারা-ই ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেছেন।

আরো কে কে যেন খেতাব বর্জন করেছেন, নামগুলো মনে করতে পারছি না।

সমস্ত দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে টালমাটাল। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিদেশীরাও ভয় পেতে শুরু করেছে। পশ্চিম জার্মানি আর যুক্তরাজ্য সরকার তাদের কিছু কিছু নাগরিককে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে। রুমী জার্মান কালচারাল সেন্টারে জার্মান ভাষা শিখত। সেই সুবাদে তার এক জার্মান টিচারের বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। সেই ম্যাডামের কাছ থেকেই জানা গেল তাঁরা চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে ম্যাডাম রুমীকে চা খেতে ডেকেছিলেন তাঁর বাড়িতে। রুমী ফিরে এসে বলল, 'ওঁরা আপাতত ব্যাঙ্ককে যাচ্ছেন। তারপর কি হবে, এখনো জানেন না।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমাদের গুলশানের বাড়ির ভাড়াটেরাও যাবে নিশ্চয়। '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তো সবাই ব্যাঙ্ককে চলে গিয়েছিল।'

আমাদের ভাড়াটে একজন আমেরিকান। তাঁর বউকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখনো তাদের নাগরিকদের সরাবার কথা চিন্তা করে নি। আমরা আপাতত কোথাও যাচ্ছি না। ঢাকাতেই আছি। ও হ্যাঁ, জাতিসংঘের কর্মচারীদেরও কিন্তু এখনো ঢাকা থেকে সরাবার কোন প্ল্যান হয় নি। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

আমি মনে মনে বললাম, 'আমাদের আর দুশ্চিন্তার কি আছে ? আমরা তো মাটিতেই বসে আছি। আছাড় খাবার ভয় আমাদের নেই। যত ভয় তোমাদেরই। '৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কিভাবে ব্যাঙ্কক পালিয়েছিলে, তা কি আর মনে নেই ?

কিন্তু দেশের অবস্থা যে গুরুতর আকার ধারণ করছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আকাশে আশঙ্কার কালোমেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।

দেশের ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্য দেবার জন্য গম বোঝাই একটা মার্কিন জাহাজ আসছিল, সেটাকে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করতে দেয়া হয় নি, ইসলামাবাদ থেকে জরুরী

নির্দেশ দিয়ে করাচি যেতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে দারুণ হৈচৈ এখানে। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্ত দাবি করে খবর কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন। সরকার কাগজে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে এই বলে যে আদৌ কোন গমবাহী জাহাজ চট্টগ্রামে আসার কথা ছিল না।

আজিম ভাই কিছুতেই প্লেনের টিকিট পাচ্ছেন না। বেচারী লণ্ডন থেকে দেশে বেড়াতে এসেছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে। প্লেনের টিকিট না পেয়ে ছুটি এখন চার সপ্তাহ পেরিয়ে যাচ্ছে। দুটো টেলিগ্রাম করেছেন, তারপর ট্রাঙ্কল করেছেন। টেলিফোনে বসের গলার স্বরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন—আর বুঝি চাকরি থাকে না। অথচ পি.আই.এ'র ফ্লাইটে নাকি রোজই শয়ে শয়ে অবাঙালি পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছে। খবর কাগজেও এ নিয়ে সংবাদ বেরিয়েছে : কোন বাঙালি প্লেনের টিকিট পাচ্ছে না, অথচ বিপুলসংখ্যক অবাঙালি রোজই প্লেনে করে বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা। এরা এদের বউ-ছেলেমেয়েদের সেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ওদের পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছিল। এখন নিজেরা পালাচ্ছে। এদিকে শয়ে শয়ে সিলেটি বাঙালি লণ্ডন থেকে ছুটি কাটাতে এসে আটকা পড়ে গেছে। টিকিট পাচ্ছে না। অথচ পি.আই.এ এদেরকে অন্য এয়ার লাইন্‌সে টিকিট এনডোর্স করে নেবার অনুমতিও দিচ্ছে না।

আজ বিকেলের প্লেনে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা এসে নেমেছেন।

মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

রুমীকে নিয়ে বড্ডো উদ্বেগে আছি। কয়েকটা দিন বাড়িতে বসে বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রচুর মোগলাই পরোটা ধ্বংস করে, তর্ক-বিতর্কে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ঝালাপালা করে, এখন আবার বাইরে দৌড়োদৌড়ি শুরু করেছে। কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, কখন খাচ্ছে, কি না-খেয়েই থাকছে, কিছুরই তাল পাচ্ছি না। আজ ওদের ড্রেসিং রুম পরিষ্কার করতে গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে নিচে জুতোর সারের পেছনে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—ইয়া মোটা মোটা ধ্যাবড়া দুটো হামানদিস্তা। অনেক আগে আমার ছোটবেলায় দাদীকে হামানদিস্তায় পান ছেঁচে খেতে দেখেছি। কিন্তু সে হামানদিস্তা দেখতে বেশ সৌকর্যমণ্ডিত ছিল। আর এ হামানদিস্তা দুটো যেমন আকাট, তেমনি ধ্যাবড়া। দু'দুটো হামানদিস্তা ওয়ার্ডরোবের ভেতর লুকোনো ? কি হবে এ দিয়ে ? রুমী বাড়ি ছিল না। জামী কাঁচুমাচু মুখে স্বীকার করল—বোমা-পটকা বানানোর কাজে হামানদিস্তা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ বটে। বোমা-পটকা ? কি গুঁড়ো করবি হামানদিস্তায় ? মালমশলা কই ? জামী দুই ঠোঁট-টেপা

আড়ষ্টমুখে আঙুল তুলে দেখাল, আলনার তলায় ঝোলানো কাপড়ের আড়ালে কয়েকটা প্লাস্টিকের ব্যাগ—পেট মোটা, সুতলি দিয়ে মুখ বাঁধা।

আমি কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কি করি ? কি বলি? সারাদেশ স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে ; ঢাকায়, রাজশাহীতে, চট্টগ্রামে—সবখানে এই দাবি তুলে শান্তিপ্রিয় বাঙালিরা আজ মরিয়া হয়ে লাঠি, সড়কি যা পাচ্ছে, তাই হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে গুলির সামনে। ঘরে ঘরে নিজের হাতে বোমা, পটকা, মলোটভ ককটেল বানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিপক্ষের ওপর। এই রকম সময়ে আমার ছেলেকে আমি কি চাইব ঘরে আটকে রাখতে ? আমি কি চাইব সে শুধু বন্ধুবান্ধব নিয়ে জাঁকিয়ে বসে, স্বাধীনতার দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে তর্ক–বিতর্ক, চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে মত্ত থাকুক ?

রুমী কখন বাড়ি ফিরেছে, টের পাই নি। ফিরেই নিশ্চয় জামীর কাছে সব শুনেছে। আমার ঘরে এসে সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে খুব শান্তস্বরে বলল, 'আম্মা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

আমি উঠে বসে বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে।'

রুমী খাটে এসে বসল আমার সামনে। আমি বললাম, 'ছোটবেলা থেকে তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছি—এমন কাজ কখনো করবে না যা আমাদের কাছে লুকোতে হবে। শিখিয়েছি—যদি কখনো কোন বিষয়ে আমাদের মতের সঙ্গে তোমার মত না মেলে, তাহলে আগে আমাদেরকে বুঝিয়ে তোমার মতে ফেরাবে, তারপর সেই কাজটা করবে।'

রুমী তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলাতে বলল, 'আমি লুকিয়ে কিছু করছি না আম্মা। আব্বু সব জানে, আব্বুই আমাকে বেবী চাচার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি বেবী চাচার সঙ্গে কাজ করি। তবে কি কাজ করি, বিস্তারিত বলা নিষেধ আছে।'

আমি রুমীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমার খুব ভয় করছে রুমী।'

রুমী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভয় করার স্টেজে আমরা আর নেই মা। আমাদের আর পেছনে হটার কোন উপায় নেই।'

'তুই যা–ই বলিস রুমী, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আজই তো কেবল মুজিব–ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হল। ফয়সালা একটা নিশ্চয় হবে।'

রুমীর মুখে কি রকম একটা হাসি ফুটে উঠল, কি যেন বলতে গেল সে, তার আগেই সিঁড়ির মুখ থেকে জামী চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা ভাইয়া, শিগগির এস, খবর শুরু হয়ে গেছে। টিভিতে শেখ মুজিবকে দেখাচ্ছে।'

হুড়মুড়িয়ে উঠে নিচে ছুটলাম। খবর খানিকটা হয়ে গেছে। শেখ মুজিবের গাড়িটা প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসছে। সাদা ধবধবে গাড়িতে পতপত করে উড়ছে কালো পতাকা। দেখে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। প্রতিবাদের কালো পতাকা উঁচিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় গিয়েছেন শেখ মুজিব। এর আগে কোনদিনও পাকিস্তান সরকার বাঙালির প্রতিবাদের এই কালো পতাকা স্বীকার করে নেয় নি। এবার সেটাও সম্ভব হয়েছে।

বুধবার ১৯৭১

সকালে চায়ের টেবিলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে খবর কাগজের ওপর। পরিস্থিতি ও চাহিদার গুরুত্ব বুঝে মাসের ২-৩ তারিখ থেকেই তিন-চারটে কাগজ রাখছি—যাতে বাড়ির সকলেই একই সঙ্গে সুখী থাকতে পারে।

সবার নজর মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠকের খবরটার দিকে। খবর অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। তাঁরা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আড়াই ঘন্টাকাল আলোচনা করেছেন। বাইরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ শুধু বলেছেন, তাঁরা দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা কেবল শুরু করেছেন। আলোচনা চলতে থাকবে, কারণ সমস্যা যা, দু'তিন মিনিটে তার সমাধান সম্ভব নয়।

আজ বুধবার সকাল দশটায় আবার বসছেন তাঁরা।

রুমী হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'আম্মা, এই খবরটা দেখেছ ?'

'কোনটা ?'

রুমী হাতের দৈনিক আজাদ পত্রিকাটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। পড়লাম খবরটা। হেডিং হচ্ছে :

জানেন কি ?

রাজধানী ঢাকায় বর্তমানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতজন পদস্থ ব্যক্তি অবস্থান করিতেছেন ?

খবরটা সংক্ষেপে হল : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ, প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল পীরজাদা, মেজর জেনারেল ওমর এবং আরো ছয়জন ব্রিগেডিয়ার ঢাকা এসেছেন। তবে এ সম্বন্ধে কোন সরকারি সমর্থন পাওয়া যায় নি। কেবল প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার সাংবাদিকদের প্রশ্নের চাপে পীরজাদা ও ওমরের ঢাকা আসার কথা স্বীকার করেছেন।

রুমী বলল, 'বুঝলে আম্মা, ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সুবিধের ঠেকছে না। বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এত সেনাপতি, সামন্ত সঙ্গে নিয়ে আসার মানেটা কি ?

আমার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল, তবু একটু ধমকের সুরে বললাম, 'তোরা খালি গুজবের আগে ছুটিস। এ খবরের কোন ভিত্তি নেই তো। লোকে আগাম আশঙ্কা করে বলছে একথা। আলোচনা তো কেবল একদিন হয়েছে, দু'চারটে দিন ধৈর্য ধরে দেখ না—নিশ্চয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঐ আনন্দেই থাকো। তোমার কি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি বলতে কিছু নেই আম্মা—' রুমীর কথায় বাধা পড়ল। কলিং বেল বেজে উঠেছে। জামী তড়াক করে উঠে দরজা খুলেই চেঁচিয়ে বলল, 'মা, মা, নিয়োগী চাচা—'

আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে তাই নাকি ? খুব ভালো দিনে এসেছেন তো। আপনাকে আমার খুব দরকার।'

অজিত নিয়োগী ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললেন, 'সেইটে জেনেই তো কেমন এসে পড়েছি, দেখুন।'

শরীফ ও আমি উঠে বসার ঘরের দিকে গেলাম। রুমী, জামী নিয়োগী সাহেবকে আদাব দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

আমি বললাম, 'দাদা, আপনার সঙ্গে আজ আমার কিছু জরুরী কথাবার্তা আছে। বসতে হবে অনেকক্ষণ। আর ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে।'

নিয়োগী দাদা হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে বাপরে। কি এমন সাংঘাতিক কথা জিগ্যেস করবেন ? একেবারে ঠিক ঠিক জবাব চাই ?'

শরীফ খানিকক্ষণ কথা বলার পর উঠে দাঁড়াল, 'আমার অফিস আছে, চললাম। আপনারা সাংঘাতিক সওয়াল-জবাব করতে থাকুন।'

শরীফ চলে যাবার পর আমি বললাম, 'আমি খুব স্পষ্ট কথায় দুটো প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক জবাব দেবেন কিন্তু দাদা।'

উনি হাসিমুখে বললেন, 'বলুন, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

আমি খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিলাম, তারপর স্পষ্ট করে কেটে কেটে বললাম, 'এক নম্বর প্রশ্ন—দেশে রক্তস্রোত বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি না। দুই নম্বর প্রশ্ন—আমার কপালে পুত্রশোক আছে কি না।'

প্রশ্ন শুনে নিয়োগী দাদা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম, 'কই জবাব দিচ্ছেন না ?'

নিয়োগী দাদা একটু হাসলেন, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন মনে হল। কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'এসব বিষয়ে কি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় ?'

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'কেন যাবে না ? আপনি এতবড় অ্যাস্ট্রলজার কত বছর ধরে কত বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন, আপনি কি বলতে চান দেশের বিষয় নিয়ে কিছুই ভাবনাচিন্তা করেন নি ?'

'করেছি বইকি। তবে —'

'তবে-টবে নয়। কি চিন্তাভাবনা করেছেন, বলুন।'

'রক্তস্রোতের সম্ভাবনা খুবই ছিল। পাকিস্তান হল মকর রাশির অন্তর্গত দেশ। মকর রাশিতে এ সময়ে আছে রাহু ও শত্রু। আর পাশাপাশি দ্বাদশ ঘরে ধনুতে অবস্থান করছে মঙ্গল। রাহু মানে ধ্বংস আর শত্রুর জন্য আগুন আসে। দ্বাদশে মঙ্গল মানেও ধ্বংস। কিন্তু বৃহস্পতি এ সময় বৃশ্চিকে একাদশ ঘরে আছে বলেই ভরসার কথা। অল্পের জন্য ভয়াবহ রক্তস্রোতের সম্ভাবনাটা এড়ানো গেছে।'

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব ?'

নিয়োগী দাদা আবারো অস্বস্তিতে পড়েছেন, বোঝা গেল। বহুক্ষণ চুপ করে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'রুমীর মঙ্গল খুব প্রবল।

জানেন তো মঙ্গল যুদ্ধের রাশি। ওকে একটু সাবধানে রাখবেন।'

আমি গোঁয়ারের মত বললাম, 'ওসব সাবধানে রাখার কথা বাদ দিন। আমার কপালে পুত্রশোক আছে কি না তাই বলুন। ওটা থাকলে লখিন্দরের লোহার ঘর বানিয়েও লাভ নেই।'

অজিত নিয়োগী অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'না। আপনার কপালে পুত্রশোক নেই। তবু ওকে সাবধান রাখবেন।'

আমার বুক থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল। আমি জ্যোতিষশাস্ত্র, ভবিষ্যদ্বাণী—এসব কোন কিছুতেই কোনদিনও বিশ্বাস করি নি। অজিত নিয়োগীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সূত্র অদৃষ্ট গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণীর নয়, সাহিত্যালোচনা ও সামাজিক মেলামেশার। এর মধ্যেই ওঁর কয়েকটা গল্পের বই বাজারে বেরিয়েছে। তবু দেশের এই রকম পরিস্থিতিতে, রুমীর রহস্যময়, উদ্‌ভ্রান্ত চালচলনে, মনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের খুঁটিটা কখন, কেমন করে যেন নড়বড়ে হয়ে গেছে। তাই অজিত নিয়োগীর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার ওপর এখন মনেপ্রাণে নির্ভর করতে চাইছি।

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঢাকা টেলিভিশন স্বাধিকার আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছে তার অভিনব গানের অনুষ্ঠান দিয়ে। এমন অনুষ্ঠান দেখি নাই কভু। ঢাকার যত প্রথম সারির নামকরা সঙ্গীতশিল্পী—ফেরদৌসী রহমান, সাবিনা ইয়াসমিন, শাহনাজ বেগম, আঞ্জুমান আরা বেগম, সৈয়দ আবদুল হাদী, খোন্দকার ফারুক আহমদ, রথীন্দ্রনাথ রায় এবং আরো অনেকে মিলে যখন গাইতে থাকেন—'সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম। চলবেই দিনরাত অবিরাম'—আর তাঁদের কয়েকটা চেহারা হাজার চেহারা হয়ে যায় ; তখন মনে হয় বুকের মধ্যে, ঘরের মধ্যে ঝড় উঠে গেছে, সে ঝড়ের মাতামাতি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

মাসুমাকে জিগ্যেস করি, 'কি করে এমন অবাক কাণ্ড সম্ভব হল ? কে করেছে ?'

মাসুমা বলে, 'এসব মন্টু মামার কীর্তি।'

মন্টু, অর্থাৎ মোস্তফা মনোয়ারকে ধরলাম একদিন, 'মন্টু বল না, কি কায়দায় শিল্পীদের একেকটা মাথা হাজার মাথা হয়ে যায় ? দু'তিন সার দাঁড়ানো মানুষ হাজার মানুষ হয়ে যায় ?'

মোস্তফা মনোয়ার তার স্বভাবসিদ্ধ বিনীত লাজুক হাসি হেসে মাথা চুলকে বলল, 'এই আর কি। যন্ত্রপাতি বিশেষ নেই তো আমাদের। এই আয়না-টায়না দিয়ে, অনেক কসরত করে—এই আর কি।'

মন্টুটা এই রকমই। নিজের কোন কৃতিত্বের কথা নিজের মুখে বলতে হলে এই রকমই তো-তো করে!

মন্টুর কীর্তি এরকম অভিনব পদ্ধতিতে আরো কয়েকটা গানের টিভি চিত্রায়ন—'আমার ঘরে আগুন জ্বেলেছে, শান্তি নিয়েছ কেড়ে,' 'জন্ম আমার ধন্য হল মাগো,' 'একতারা তুই দেশের কথা বলরে আমায় বল।' এইসব গান টিভিতে যতো দেখানো হয়, ঢাকার ঘরের ভেতরে সোফায় বসে থাকা শান্ত, নিরীহ মানুষের বুকেও ততো ঝড়ের দোলা লাগে, বাইরে পথে-প্রান্তরে-বন্দরে-জংশনে যারা রক্তাক্ত সংঘর্ষে নেমেছে, তাদের মাঝে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

শুক্রবার ১৯৭১

আজ রুমী একটা অভিনব স্টিকার নিয়ে এসেছে—'একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন।' বাংলায় লেখা স্টিকার জীবনে এই প্রথম দেখলাম। রুমী খুব যত্ন করে স্টিকারটা গাড়ির পেছনের কাচে লাগাল। স্টিকারের পরিকল্পনা ও ডিজাইন করেছেন শিল্পী কামরুল হাসান। উনি অবশ্য নিজেকে শিল্পী না বলে 'পটুয়া' বলেন। কয়েকদিন আগে 'বাংলার পটুয়া সমাজ' বলে একটা সমিতি গঠন করেছেন। উনিই তার আহ্বায়ক। গত শুক্রবারে এই সমিতির একটা সভাও হয়ে গেল। শিল্পী সৈয়দ শফিকুল হোসেন এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ইনি শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার এস. আর. হোসেনের ছোট ভাই।

'বাংলার পটুয়া সমাজ'-এর এই সভাতে শাপলা ফুলকে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার এক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে বৃহত্তর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে শিল্পীরা ঠিক করেছেন কার্টুন, ফেস্টুন, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করে সর্বত্র বিতরণের ব্যবস্থা নেবেন।

এই স্টিকার বোধহয় ঐ কর্মপন্থারই প্রথম পদক্ষেপ।

সোমবার ১৯৭১

ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও গতকাল একমুহূর্ত বিশ্রাম পায় নি বাড়ির কেউ। সারাদিনে এ্যা-তো মেহমান এসেছিল যে চা-নাশতা দিতে দিতে সুবহান, বারেক, কাসেম সবাই হয়রান হয়ে গিয়েছিল। আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু দেশব্যাপী দ্রুত প্রবহমান ঘটনাবলির উত্তেজনায় অন্য সবার সঙ্গে আমিও এত টগবগ করেছি যে টের পাই নি কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে।

সকাল ন'টায় এলেন আমার বড় ননদ লিলিবু ও নন্দাই একরাম ভাই। প্রতি রবিবারে ওঁরা নিয়মিত আসে বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটাবার জন্য।

রুমী, জামী আজ সাড়ে আটটাতেই নাশতা খাওয়া শেষ করে কোথায় যেন গেছে। আমি আর শরীফ তখনো খাবার টেবিলে, খবর কাগজ নিয়ে। একরাম ভাই লিলিবুকে বললেন, 'তুমি উপরে যাও বুড়ার কাছে। আমি এইখানে একটু কথা কয়ে যাই।' লিলিবু সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেলেন। একরাম ভাই এসে একটা চেয়ারে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

এর কারণ আছে। রুমীর মতিগতি দেখে শঙ্কিত হয়ে সপ্তাহখানেক আগে একরাম ভাইকে বলেছিলাম, 'আপনি রুমীকে ডেকে একটু কথাবার্তা বলুনতো ! ও কি ভাবে, কি চায়—।' একরাম ভাই রুমীকে তাঁর বাসায় ডাকিয়ে দু'দিন কথাবার্তা বলেছেন। আমাকে মুখে কোন প্রশ্ন করতে হল না, একরাম ভাই নিজেই বলার জন্য এখানে এসে বসেছেন, বুঝতে পারছি।

উনি বললেন, 'রুমীর সঙ্গে আলাপ করে আমি তো হতবাক। এইটুকু ছেলে এই বয়সে এত পড়াশোনা করে ফেলেছে ? আগে তো ভাবতাম বড়লোকের ছাওয়াল হুশ হুশ করে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়—চোঙ্গা প্যান্ট পরে, গ্যাটম্যাট করে ইংরেজি কয়—আলালের ঘরের দুলাল। কিন্তু এখন দেখতিছি এ বড় সাংঘাতিক চিজ। মার্কস-এঙ্গেলস একেবারে গুলে খেয়েছে। মাও-সে-তুংয়ের মিলিটারি রাইটিংস সব পড়ে হজম করে নিয়েছে। এই বয়সে এমন মাথা, এমন ক্লিয়ার কনসেপ্সান্, বাউরে, আমি তো আর দেখি নাই।'

একরাম ভাইয়ের কথার ধরনই এই রকম। বকুনির সময় যেমন ঠেসে বকে দেন, প্রশংসার সময়ও তেমনি অঢেল প্রশংসা করেন। কোথাও কোন কিপটেমি নেই।

আমি ছলছল চোখে বললাম, 'এত যে ভালো বলছেন, এত মাথা নিয়ে এ ছেলে বাঁচলে হয়। কি যে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে ! আপনি ওকে আরেকটু বোঝাবেন। এখনো তো বলতে গেলে শিশু ও, কেবলে আই. এস. সি. পাস করেছে—ছাত্রজীবন সবটাই পড়ে রয়েছে।'

একরাম ভাই 'হুম' বলে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, 'দেশের অবস্থা তো ভাল দেখছি না। ইয়াহিয়া-মুজিবের বৈঠকের কি পরিণতি হবে, তাও

তো বোঝা যাচ্ছে না। গতকাল আবার ভুট্টো এসেছে বারোজন উপদেষ্টা নিয়ে।'

'ওরা খুব ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে। কাগজে দেখলাম ভীষণ কড়া মিলিটারি পাহারায় প্লেন থেকে নেমেছে। হোটেল ইন্টারকনে আছে—সেখানে নাকি ভয়ানক কড়াকড়ি সিকিউরিটি।'

শরীফ বলল, 'কালকে এসেই ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে দু' ঘন্টা মিটিং করেছে। অথচ ইয়াহিয়া যেদিন এল, সেদিন সারাদিন মুজিবের খোঁজই করল না। পরদিন দুপুরেরও পরে আড়াইটের দিকে দু'জনের বৈঠক হয়েছে।'

একরাম ভাই বললেন, 'কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ভাব মনে হচ্ছে।'

কলিং বেল বেজে উঠল। কাসেম ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকলেন মোর্তুজা ভাই, মোস্তফা ভাই।

আমরা খাবার টেবিল থেকে উঠে বসার ঘরের দিকে গেলাম। বসার পর কুশল বিনিময়ও হয় না—সরাসরি প্রশ্ন সবার মুখে : কি মনে হচ্ছে দেশের অবস্থা ?

শরীফ বলল, 'আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে জ্বলন্ত বালিতে খৈ ফুটছে। ইয়াহিয়া, মুজিব, ভুট্টো বৈঠক করছে, দেশের সর্বশ্রেণীর লোক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি.এস.পি, ই.পি.সি.এস—সবাই নিজ নিজ পেশার ব্যানারে মিটিং করছে, মিছিল করছে। জয়দেবপুরে মিলিটারি, পাবলিকের ওপর গুলি করছে, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মিরপুরে, চট্টগ্রামে, পার্বতীপুর-সৈয়দপুরে বাঙালি বিহারি খুনোখুনি রক্তারক্তি হচ্ছে—সেনাবাহিনী বিহারিদের উস্কানি আর সাপোর্ট দিচ্ছে।'

মোস্তফা ভাই বললেন, 'আগামীকাল কি কোন রকম গোলমাল হবে বলে মনে হয় ?'

শরীফ বলল, 'মনে হয় না। তবে জয়দেবপুরের ঘটনায় লোকজন নতুন করে খেপেছে। মিরপুরেও পরিস্থিতি খুব গরম। এদিকে বাঙালিরাও বেশ জঙ্গী হয়ে রয়েছে। গত পরশু বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন গণবাহিনীর কি সব কুচকাওয়াজ হয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় পাঁচশো ছেলেমেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মার্চপাস্ট করেছে। তা দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছে। কাজেই আগামীকাল শেষ পর্যন্ত কি হবে, কিছুই বলা যায় না। আগামীকালও তো আবার পল্টন ময়দানে জয়বাংলা গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ আছে।'

আগামীকাল ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এর জন্য সারাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন ও উত্তেজনা। জনমনে বিপুল সাড়া ও উদ্দীপনা। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান এবং কর্মসূচী দিয়েছে ২০ মার্চেই। ভাসানী ন্যাপ এই তারিখে স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে রোজই ঢাকার রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথসভা করছে। অন্যান্য ছাত্রদল ও শ্রমিক দল এবং বিভিন্ন দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও এই দিনকে সামনে রেখে মহা তোড়জোড় শুরু করেছে।

মোর্তুজা ভাই বললেন, 'ভাবী আজকের কাগজে স্বাধীন বাংলা পতাকার ছবি বেরিয়েছে, দেখেছেন ?'

আমি বললাম, 'দেখব না কেন—ইনফ্যাক্ট, পতাকা আমি কিনেও এনেছি একগাদা।'

'একগাদা কেন ?'

আমি হেসে বললাম, 'যারা শেষ মুহূর্তে কিনতে পাবে না—তাদের বিলোব বলে ?'

'তাই নাকি ? আনুন তো একটা, দেখি।'

আমি দোতলায় উঠে কয়েকটা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এলাম। ওঁরা সবাই একেকটা হাতে নিয়ে খুলে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'আপনারা নিয়ে যান একটা করে—কাল ওড়াবেন।'

ওঁরা খুশি হয়ে একটা করে নিয়ে গেলেন।

বারোটায় এলেন শরীফের বন্ধু ও সহকর্মী ইঞ্জিনিয়ার বাঁকা ও মঞ্জুর। বাঁকার ভালো নাম এস. আর. খান, কিন্তু বাঁকা নামের বিপুল বিস্তারের নিচে আসল নাম চাপা পড়ে গেছে। ওঁদেরও একটা করে পতাকা দিলাম। ওঁরা যেতে না যেতেই এলেন ফকির। বিকেলে মিনিভাইরা। এমনি করে রাত দশটা পর্যন্ত বহুজন।

দুপুরে খাওয়ার সময় কিটি বলল, 'আম্মা, আমাকে একটা পতাকা দেবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

আজ কিটি এখান থেকে চলে যাবে। গুলশানে এক আমেরিকান পরিবারে থাকবে আপাতত। গণআন্দোলন, মিটিং, মিছিল ইত্যাদির কারণে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণা ও বিক্ষোভের কারণে কিটির এখন কোন বাঙালির বাড়িতে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। মাত্র দু'দিন আগে ধানমণ্ডিতে মার্কিন কনসাল জেনারেলের বাড়িতে বোমা ছোঁড়া হয়েছে, যদিও কেউ হতাহত হয় নি। কিটির নিরাপত্তার কারণেই কিটিকে এখান থেকে সরান দরকার। বিকেলে মিঃ চাইল্ডার এলেন কিটিকে নিতে। খুব ভারি মন নিয়ে কিটি বিদায় নিল। আমাদেরও বেশ মন খারাপ হল।

আরো একটা কারণে আজ মন খারাপ। সুবহান আজ চাকরি ছেড়ে চলে গেল। ওর নাকি আর রান্নাবান্নার কাজ ভালো লাগে না। ও এখন আন্দোলন করবে। তা না হয় করবে। কিন্তু আমাদের বাসার রান্নাবান্নার কি হবে ?

মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ প্রতিরোধ দিবস।

খুব সকালে বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ছাদে গিয়ে কালো পতাকার পাশে আরেকটা বাঁশে ওড়ালাম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল আনন্দ, উত্তেজনা, প্রত্যাশা, ভয়, অজানা আতঙ্ক—সবকিছু মিশে একাকার হয়ে...

নাশতা খাওয়ার পর সবাই মিলে গাড়িতে করে বেরোলাম—খুব ঘুরে...

শহরে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে। সবখানে সব বাড়িতে কালো পতাকার পাশাপাশি সবুজে-লালে-হলুদে উজ্জ্বল নতুন পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। ফটো তুললাম অনেক। ঘুরতে ঘুরতে ধানমণ্ডি দুই নম্বর রোডে বাঁকার বাসায় গিয়ে নামলাম। সেখানে খানিকক্ষণ বসে, গেলাম ডাঃ খালেকের বাসায়। বাঁকার বাসার ঠিক সামনেই রাস্তার ও পাশে। ডাঃ খালেকের বাসায় দেখা হল তাঁর শালী মন্দিরা ও তার স্বামী নেভির অবসরপ্রাপ্ত কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমের সঙ্গে। নেভি থেকে অবসর নেয়ার পর মোয়াজ্জেম একটা রাজনৈতিক দল গঠন করেন দু'বছর আগে—নামটা বেশ বড়—'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি।' মোয়াজ্জেমের সঙ্গে যখনি দেখা হয়, তিনি হেসে হেসে বলেন, শেখ সাহেবের ছয় দফা, আমার কিন্তু এক দফা। তা হল পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা।'

আজ মোয়াজ্জেম বললেন, 'শেখ সাহেবও এখন একদফা অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হয়েছেন।'

'কি রকম ?'

'আজ সকালে ওঁকেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলতে হয়েছে ওঁর নিজের বাড়িতে।'

মিসেস খালেক বললেন, 'পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ দেখতে গিয়েছিলেন নাকি ?'

'নাঃ। শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম নতুন পতাকা দেখতে। অফিস বিল্ডিংগুলোতেও স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছে। ইন্টার কন্টিনেন্টালেও। ওখানে এত মিলিটারি থাকা সত্ত্বেও পারলো কি করে ?

মোয়াজ্জেম বলে উঠলেন, 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। বাঙালির মনও তাই।'

'বিদেশী দূতাবাসগুলোতেও নতুন পতাকা—কি যে ভালো লাগছিল দেখতে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে। কামরুল হাসানের আঁকা কয়েকটা দুর্দান্ত পোস্টার দেখলাম। মিনারের সিঁড়ির ধাপের নিচে সার সার সেঁটে রেখেছে। প্রত্যেকটা পোস্টারে একটা মানুষের মুখ, নিচে লেখা 'এদেরকে খতম কর।' মুখটা একদম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মুখের মত।'

'বলেন কি ? আমাদের যেতে হবে তো দেখতে !'

টেলিভিশনের অনুষ্ঠান যে আজকে শেষই হয় না ! অন্যদিন সাড়ে ন'টার মধ্যে সব সুমসাম। আজ দেখি মহোৎসব চলছে তো চলছেই। সুকান্তর কবিতার ওপর চমৎকার দুটো অনুষ্ঠান হল। একটা—'ছাড়পত্র', মোস্তফা মনোয়ারের প্রযোজনা। ডঃ নওয়াজেশ আহমদের ফটোগ্রাফির সঙ্গে কবিতার আবৃত্তি। আরেকটা—'দেশলাই', বেলাল বেগের প্রযোজনা। সুকান্তর দেশলাই কবিতাটি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে টিভি পর্দায় দেখা গেল অসংখ্য দেশলাইয়ের কাঠি একটার পর একটা জ্বলে উঠছে। একটা কাঠি থেকে আরেকটার আগুন ধরতে ধরতে সবগুলো মশালের মত জ্বলতে লাগল পুরো টিভি পর্দা জুড়ে।

এরপর শুরু হল আবদুল্লাহ আল মামুনের এক নাটক—'আবার আসিব ফিরে।' ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের শহীদ একটি ছেলের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একাত্তরের গণআন্দোলনে। নাটক ২৩ মার্চের রাত পৌনে এগারোটায় শুরু হয়ে শেষ হয়

২৪ মার্চের প্রথম প্রহরে। রাত বারোটা বেজে নয় মিনিটে ঘোষক সরকার ফিরোজউদ্দিন সমাপনী ঘোষণায় বলেন :

'এখন বাংলাদেশ সময় রাত বারোটা বেজে নয় মিনিট—আজ ২৪শে মার্চ বুধবার। আমাদের অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি।'

এরপর পাকিস্তানি ফ্ল্যাগের সঙ্গে 'পাক সারজামিন শাদবাদের' বাজনা বেজে উঠল।

এতক্ষণে রহস্য বোঝা গেল। ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবসে বীর বাঙালিরা টেলিভিশন পর্দায় পাকিস্তানি পতাকা দেখাতে দেয় নি।

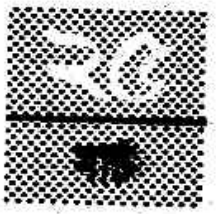

বৃহস্পতিবার ১৯৭১

২৩ মার্চের উজ্জ্বল প্রতিরোধ দিবসের পর কি যেন এক কালোছায়া সবাইকে ঘিরে ধরেছে। চারদিক থেকে খালি নৈরাশ্যজনক খবর শোনা যাচ্ছে। ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর বৈঠক যেন সমাধানের কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না। শেখ মুজিব প্রতিদিন প্রেসিডেন্ট ভবনে যাচ্ছেন আলোচনা করতে, বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলছেন আলোচনা এগোচ্ছে; ওদিকে আন্দোলনকারী জঙ্গী জনতাকে বলছেন দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যান। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন।

বেশকিছু দিন থেকে মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে প্রতিদিন নাকি প্লেনে করে সাদা পোশাকে প্রচুর সৈন্য এসে নামছে বিমানবন্দরে। বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা, তবু বুক কেঁপে ওঠে। ওদিকে চট্টগ্রাম থেকে দু'তিনজন বন্ধুর টেলিফোনে জানা গেছে—চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সে অস্ত্র চট্টগ্রামের বীর বাঙালিরা খালাস করতে দেবে না বলে মরণপণ করে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। ওদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

রুমীর মুখে দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল খামছে ধরে রুমী বলল, 'আমা বুঝতে পারছ না মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা ওদের সময় নেবার অজুহাত মাত্র। ওরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে না। স্বাধীনতা আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম করে।'

আমি শিউরে উঠলাম, 'বলিস কিরে ? পাকিস্তান আর্মির আছে যুদ্ধের লেটেস্ট মডেলের সব অস্ত্রশস্ত্র। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবি কি দিয়ে ?'

রুমী উত্তেজিত গলায় বলল, 'একজ্যাক্টলি—সেই প্রশ্ন আমারও। সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ রোজ প্রেসিডেন্ট হাউসে যাচ্ছেন আর আসছেন, আলোচনার কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। ওদিকে প্লেনে করে রোজ সাদা পোশাকে হাজার হাজার সৈন্য

এসে নামছে, চট্টগ্রামে অস্ত্রভর্তি জাহাজ ভিড়ছে। আর এদিকে ঢাকার রাস্তায় লাঠি-হাতে বীর বাঙালিরা ধেই ধেই করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে পেট-পুরে মাছ-ভাত খেয়ে ঘুম দিচ্ছে। পল্টন ময়দানে ডামি বন্দুক ঘাড়ে কুচকাওয়াজ করছে। আমরা কি এখনো রূপকথার জগতে বাস করছি নাকি ? ছেলেমানুষিরও একটা সীমা থাকা দরকার।'

'তাহলে এখন উপায় ?'

'উপায় বোধহয় আর নেই আম্মা।'

ভয় আর আতঙ্কের একটা হিম বাতাস আমাকে অবশ করে দেয় যেন, 'না, না, ওরকম করে বলিস না। তুই শেখের রাজনীতি সমর্থন করিস না, তাই একথা বলছিস। তোরা হলি জঙ্গী বাঙালি, খালি মার-মার, কাট-কাট। শেখ ঠিক পথেই আন্দোলনকে চালাচ্ছেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও এভাবে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে জনগণ তাদের দাবি ঠিকই আদায় করে নেবে ?'

'আম্মা, তুমি কোন আহাম্মকের স্বর্গে বসে আছ ? শুধু কয়েকটা বিষয় তলিয়ে দেখ— পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে যা যা ঘটছে, সবই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক হিসেবে এগুলো সবই বিষম রাষ্ট্রদ্রোহিতা। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট খোদ হাজির, অথচ দেশ চলছে শেখের কথায়। লোকে অফিস-আদালত-ব্যাঙ্ক সব চালাচ্ছে শেখের সময়ে। তারপর দেখ পাকিস্তান সরকারের হেনস্তা। টিক্কা খানকে কোন বিচারপতি শপথ গ্রহণ করাতে রাজি হল না বলে বেচারা গভর্নর হতে পারল না। শুধু মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটার হয়ে কাজ চালাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসে নামল আর তার বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ। সেনাবাহিনীর জন্য কোন বাঙালি খাবার জিনিস বেচছে না। ওরা কতদিন ডাল-রুটি খেয়ে থেকেছে। তারপর প্লেনে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খাবার আনতে হয়েছে। এতসব কাণ্ডের পরও ইয়াহিয়া সরকার একদম মুখ বুজে চুপ করে আছে। কেন বুঝতে পারছ না ? ওরা শুধু সময় নিচ্ছে। ওরা আলোচনার নাম করে আমাদের ভুলিয়ে রাখছে। শেখ বড্ডো দেরি করে ফেলছেন। এপথে, এভাবে আমরা বাঁচতে পারব না।'

আমি রাগ করে বললাম, 'দাড়ি কামিয়ে সাবান মেখে ঠাণ্ডা পানিতে ভালো করে গোসল কর দেখি বাপু—মাথা বড্ড বেশি গরম হয়ে গেছে।'

রুমী নীরবে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি কেমন যেন চুপসে গেলাম। নিজের মনেও যেন আর জোর পাচ্ছি না।

আজ আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী-দম্পতি আতিক ও বুলুর বাসায় রাতের খাবার দাওয়াত আছে। এরকম অবস্থায় দাওয়াত খেতে যেতে ইচ্ছে করে না, আবার ঘরে বসে থাকলেও ফাঁপর লাগে। শরীফের মিটিং ছিল ঢাকা ক্লাবে। অতএব আমি একাই গেলাম আতিকের বাসায়। সেখানে দেখা হল এনায়েতুল্লাহ খান ও তার স্ত্রী লীনার সঙ্গে, লীনার ছোট ভাই জিল্লুর রহমান খান ও তার আমেরিকান বউ মার্গারেটের সঙ্গে। আরো এসেছে আতিকের বন্ধু হালিম ও তার স্ত্রী মণি, আতিকের ভায়রাভাই ফাত্তাহ ও তার স্ত্রী। সকলের মুখে একই কথা : কি হবে ? কি হবে ?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নাকি কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে প্লেনে চড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেছে ? রাস্তায় নাকি ইতোমধ্যেই আর্মি নেমে গেছে ? আমি বুঝতে পারছি না আর্মি কেন নামবে।

সাড়ে নয়টার সময় মাসুমা ফিরল টিভি অফিস থেকে। কিছুদিন আগে বড়ভাই রফিকুল ইসলামের বাসা ছেড়ে এখন মেজভাই আতিকুল ইসলামের বাসায় থাকছে। সে এল ঝড়ে-পড়া পাখির মত বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে। সবার মধ্যে যে আশঙ্কা, তার মধ্যেও তাই। বরং টিভি স্টেশনে সে আমাদের চেয়ে বেশিকিছু শুনেছে। কিন্তু মাসুমা আমাদের সঙ্গে বসল না, বলল, 'খুব বেশি টায়ার্ড আমি, নিজের ঘরে যাই।' অনেক বলা সত্ত্বেও সে খেল না আমাদের সঙ্গে।

আমাদেরও খিদে ছিল না। কোনমতে খাওয়া সাবলাম সবাই। সাড়ে দশটায় শরীফ ফোন করল, 'এখনো দেরি করছ কেন ? শহরের অবস্থা ভালো নয়। বহু জায়গায় জনতা নতুন করে ব্যারিকেড দিচ্ছে। ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। অনেক রাস্তায় আর্মির গাড়ি দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এস।'

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসলাম। রুমী-জামী ছুটে এল এ ঘরে। কি ব্যাপার ? দু'তিন রকমের শব্দ—ভারি বোমার বুমবুম আওয়াজ, মেশিনগানের ঠাঠাঠাঠা আওয়াজ, চিঁ-ই-ই-ই করে আরেকটা শব্দ। আকাশে কি যেন জ্বলে-জ্বলে উঠছে, তার আলোয় ঘরের ভেতর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠছে। সবাই ছুটলাম ছাদে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণদিকে মাঠ পেরিয়ে ইকবাল হল, মোহসীন হল, আরো কয়েকটা হল, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের কয়েকটা বিল্ডিং। বেশির ভাগ আওয়াজ সেইদিক থেকে আসছে, সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ, চিৎকার। বেশিক্ষণ ছাদে দাঁড়ানো গেল না। আগুনের ফুলকির মত কি যেন চিঁ-ই-ই-ই শব্দের সঙ্গে এদিক পানে উড়ে আসছে। রুমী হঠাৎ লাফ দিয়ে কালো আর স্বাধীন বাংলা পতাকা দুটো নামিয়ে ফেলল।

হঠাৎ মনে পড়ল একতলায় বারেক, কাসেম ওরা আছে। হুড়হুড় করে সবাই নিচে নেমে গেলাম। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে উঠানের দিকের দরজাটা খুলতেই আমাদের অ্যালসেসিয়ান কুকুর মিকি তীর বেগে ঘরে ঢুকে আমাদের সবার পায়ে লুটোপুটি খেতে খেতে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। উঠানের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম, 'বারেক-কাসেম।' ওদের ঘরের দরজা খুলে বারেক, কাসেম কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, 'তোমরা তোমাদের বিছানা নিয়ে এ ঘরে চলে এস।'

মিকিকে কিছুতেই আর ঘর থেকে উঠানে নামানো গেল না। এত গোলাগুলির শব্দ ও ট্রেসার হাউইয়ের নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে সে দিশেহারা হয়ে গেছে। রুমী তার ঘাড়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ভয় নেই, মিকি ভয় নেই। তুই আমাদের সঙ্গে উপরে থাকবি।' তাকে উপরেও নেয়া গেল না। কি এক মরণ ভয়ে ভীত হয়ে সে খালি কোণা খুঁজছে। শেষে সিঁড়ির নিচের ঘুপচি কোণটাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল।

বসার ঘরে ফোন তুলে দেখি, ফোন ডেড। উপরে উঠে গেলাম। বাবার গলা শুনলাম। রুমী গিয়ে বাবার হাত ধরে মৃদুস্বরে তাঁকে কি কি যেন বলতে লাগল।

বাকি রাত আর ঘুম এল না। আবার ছাদে গেলাম। দূরে দূরে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দিক থেকে গোলাগুলি, মেশিনগানের শব্দ আসছে, ট্রেসার হাউই আকাশে রংবাজি করে চলেছে—দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে সবদিকেই দূরে আগুনের স্তম্ভ ক্রমেই স্পষ্ট ও আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে।

কারো মুখে কোন কথা নেই। রুমী, জামী নীরবে থমথমে মুখে সুতলির বাঁধন খুলে প্লাস্টিক ব্যাগ একে একে উপুড় করল কমোডে। একটু করে ফ্ল্যাশ করে, খানিক অপেক্ষা করে, আবার ঢালে, আবার ফ্ল্যাশ করে। একসঙ্গে সব মালমশলা ঢাললে কমোডের নল বন্ধ হয়ে যাবে। জামী বাসনমাজা পাউডার দিয়ে তিন চারবার করে হামানদিস্তা দুটো মাজল আর ধুল। একবার ধুয়ে শুঁকে দেখে, আবার মাজে, আবার ধোয়।

এ কাজ সেরে রুমী মার্কস, এঙ্গেলসের বই, মাও-সে-তুংয়ের মিলিটারি রচনাবলি সব একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরল। আমরা চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় বইগুলো লুকোনো যায়। মাটিতে পুঁততে চাইলে, বইগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে মনে পড়ল বারেকদের ঘরের পেছনে বাউণ্ডারি ওয়ালের এক জায়গায় একটা কোটরমত আছে। প্রতিবেশী হেশাম সাহেবের বাউণ্ডারি ওয়ালের দরুন এই কোটরটার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বইয়ের প্যাকেটটা ফেলে দিলে লুকোনোও থাকবে, নষ্ট হবে না। ভোরের আলো অল্প একটু ফুটতেই রুমী সাবধানে গুঁড়ি মেরে ওখানে গিয়ে বইয়ের প্যাকেটটা রেখে দিল। তার ওপর ফেলল কয়েকটা শুকনো নারকেলের পাতা।

শুক্রবার ১৯৭১

ছ'টার দিকে হঠাৎ কানে এল খুব কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট গলার ডাক—'আপা, আপা'। চমকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বাগানের একটা জবা গাছের নিচে কুঁকড়ি মেরে বসে আছে কামাল আতাউর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অনার্স পরীক্ষার্থী, মোহসীন হলে থাকে। ছুটে নিচে নেমে গেলাম। দরজা খুলে উদ্‌ভ্রান্ত, প্রায় অচেতন কামালকে ধরে তুলে ঘরে নিয়ে এল রুমী-জামী। ও সারারাত হলের একতলার একটা বাথরুমে আরো দশ-বারোটা ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে ছিল। ট্রেসার, হাউইয়ের দরুন রাতে বেরোতে সাহস পায় নি। এখন সকালের আলো ফুটতে ট্রেসার, হাউই বন্ধ হয়েছে। ওরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে মাঠ, খানা-খোন্দল, রেললাইন পুরো এলাকাটা চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কামালকে সুস্থ করে রেডিও খুললাম। সুরা বাকারার পর খালি একটা বাজনাই বারেবারে বাজছে—আমার প্রিয় একটা গান 'কোকিল ডাকা, পলাশ-ঢাকা আমার এদেশ

ভাইরে' —এই গানের সুরে তৈরি যন্ত্রসঙ্গীত। সাতটার সময় পাশের ডাঃ এ. কে. খানের বাড়ি গেলাম ফোন করতে। ওঁদের ফোনও ডেড। ক্রমে ক্রমে আমাদের রাস্তার আরো সব বাড়ির লোকজন সাবধানে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। সবারই মুখে আতঙ্ক। সবাই সারারাত জেগেছে। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না—কি হচ্ছে। সব বাড়ির ফোনই ডেড।

বাড়ি চলে এসে খাবার টেবিলে বসে রইলাম, রেডিও সামনে নিয়ে। জামীকে বললাম, 'বারেককে সঙ্গে নিয়ে দাদাকে ওঠাও, মুখ ধোয়াও, নাশতা খাওয়াও।'

কাসেম যন্ত্রচালিতের মত টেবিলে চা-নাশতা দিয়ে গেল। নাশতা ফেলে সবাই চায়ের কাপ টেনে নিলাম।

সাড়ে ন'টার সময় হঠাৎ যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হল। শোনা গেল একটা রুক্ষ অবাঙালি কণ্ঠস্বর। প্রথমে উর্দু এবং পরে ইংরেজিতে বলল। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ থাকবে। কারফিউ ভঙ্গ করে কেউ বাইরে বেরোলে কি শাস্তি, তাও বলল। আর বলল, 'মার্শাল ল' জারি করা হয়েছে। তার নিয়মকানুনগুলো এক এক করে বলে যেতে লাগল। বেতার-ঘোষকের উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি শুনে মনে হল লোকটা একটা সেপাই-টেপাই কিছু হবে। সামরিক সরকার আর কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে ওকে দিয়ে ঘোষণাগুলো করাচ্ছে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। যা তাণ্ডব হচ্ছে চারদিকে, কারফিউ না দিলেও বাইরে বের হয় কার সাধ্যি ! গোলাগুলির শব্দ থামেই না। মাঝে-মাঝে কমে শুধু। আগুনের স্তম্ভ দেখার জন্য এখন আর ছাদে উঠতে হয় না। দোতলার জানালা দিয়েই বেশ দেখা যায়। কালো ধোঁয়ায় রৌদ্র করোজ্জ্বল নীল আকাশের অনেকখানিই আচ্ছন্ন।

মিকির কান্নায় অস্থির হয়ে উঠেছি সবাই। ওর অ্যালসেসিয়ান চরিত্রই বদলে গেছে যেন। অবিশ্রান্ত গোলাগুলির শব্দে এই জাতের সাহসী কুকুর যে এরকম কাহিল ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়বে, তা কে ভেবেছিল ? ওকে কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না। আমরা সবাই পালা করে ওকে কাছে টেনে ওর গলা জড়িয়ে ধরে সুস্থির রাখার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না।

বাবাকে নিয়েও হয়েছে মুশকিল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কেন, কি দোষে নিজের দেশের লোকজনকে মারছে, তা ওঁকে বোঝাতে গিয়ে আমাদের সবার মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেল। আমার ভয় হচ্ছে ওঁর আবার ব্লাড প্রেসার না বেড়ে যায়।

টেলিফোন বিকল, রেডিও পঙ্গু, বাইরে কারফিউ—গোলাগুলির শব্দের চোটে প্রাণ অস্থির, বাইরে কি হচ্ছে কিছুই জানবার উপায় নেই। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী স্তূপ সংবাদদাতা কামাল আতাউর রহমান। সকাল থেকে আমার বারবার প্রশ্নে একই কথা বলতে বলতে কামালও যেন হাঁপিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।

'আচ্ছা কামাল, রাত বারোটার সময় তুমি কি করছিলে ?'

'আমি ? আমি একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম—'বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম।' ২৭ তারিখে রেডিও প্রোগ্রামে পড়বার জন্য।

'কখন গোলাগুলির শব্দ শুনলে ?'

'ঐ বারোটার দিকেই। হয়তো দু'চার মিনিট পরে। আমার এক বন্ধু এসে বলল, 'তুই এখনো হলে রয়েছিস ? জানিস না শহরের অবস্থা ভয়ানক খারাপ ? আর্মি আসছে ক্যাম্পাস অ্যাটাক করতে ? আমি বাড়ি চললাম। তুইও বেরিয়ে যা।' কিন্তু আমরা কেউই আর বেরোবার চান্স পেলাম না। তখুনিই কানে এল ভয়ানক গোলাগুলির শব্দ। একটু পরেই চারদিক আলো হয়ে উঠতে লাগল। একবার করে আলো জ্বলে আর গুলিগোলা ছোটে। আমার ঘর ছিল পাঁচতলায়, তাড়াতাড়ি একতলায় নেমে এলাম। হাজী মোহসীন হলের দক্ষিণে ইকবাল হল—তার ওপাশে এস. এম. হল। মনে হল ভারি ভারি কামানের গোলা দিয়ে মিলিটারিরা ইকবাল হল উড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের হলের দিকেও গুলি ছুটে আসছিল।'

'তোমাদের হল আক্রমণ করে নি ?'

'না, আমরা প্রতিমুহূর্তে ভয় করছিলাম, এই বুঝি হাজী মোহসীনেও এল। কিন্তু ওরা আসে নি।'

'আর কোথায় কোথায় ওরা অ্যাটাক করেছে বলে মনে হয় ?'

'ঠিক বলতে পারব না। মনে হয় এস. এম. হল, জগন্নাথ হল, শহীদ মিনার। ঐদিক থেকেই শব্দ বেশি পাওয়া গেছে।'

'তোমার কি মনে হয় ? ইকবাল হল, এস. এম. হল সব একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ? সব ছেলেদের মেরে ফেলেছে ?'

'কি করে বলব ? আমরা তো একতলার বাথরুমে লুকিয়ে ছিলাম। শব্দ শুনে মনে হয়েছে ভারি ভারি গোলা। মোহসীন হলের মাথার ওপর দিয়েও গুলি ছুটে আসছিল। জানালার কাচ ভাঙার শব্দ পেয়েছি সারারাতই।'

এক পর্যায়ে কামাল বাথরুমে গেলে রুমী আমাকে বলল, 'ওকে আর জিগ্যেস কোরো না তো আম্মা। দেখছ না ওর কষ্ট হচ্ছে।'

'তাতো দেখছি। কিন্তু কি যে হচ্ছে চারদিকে, তাই বুঝবার জন্য' —

'বুঝবার আর কি আছে আম্মা ? যা ঘটবার কথা ছিল, তাইতো ঘটেছে।'

চুপ করে রুমীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। রুমী চোখ ফিরিয়ে নিল। কাল রাত থেকে ও বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। থম ধরে আছে। আমি ভাবছি : রুমীর কথাই ঠিক হল।

রুমী নিশ্চয় ভাবছে, কেমন জব্দ আম্মা ? আহাম্মকের স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়েছ তো।

কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়। এক সময় উঠে সদর দরজা খুলে গাড়ি-বারান্দায় গেলাম। আমাদের বাসার সামনের এই গলিটা কানা। এলিফ্যান্ট রোড থেকে নেমে এসে আমাদের বাসা পেরিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। ওই বন্ধ জায়গাটার ওপরে ডাঃ এ. কে. খানের বাড়ি। বন্ধ গলি হওয়ার মস্ত সুবিধে—এখানে বাইরের লোকের চলাচল বা ভিড় নেই। এ রাস্তার বাড়িগুলোর বাসিন্দারা—আমরা—অনেক সময় গলির ওপর দাঁড়িয়ে গল্প করি। গলিটা যেন আমাদের সকলের এজমালি উঠান। ১৯৫৯ সালে এখানে বাড়ি করে উঠে আসার পর থেকে এদেশে যতবার কারফিউ পড়েছে, আমরা বাড়ির সামনের এই গলিতে দাঁড়িয়ে বহু সময় গল্পগুজব করে কাটিয়েছি। আজ কিন্তু গাড়ি-বারান্দা পেরিয়ে গলিতে পা রাখতে সাহস হল না। গোলাগুলির শব্দে এখনো আকাশ ফাটছে। মাঝে-মাঝে কুকুরের

চিৎকার কানে ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন মানুষেরও চিৎকার। খুব অস্পষ্ট। নাকি আমার ভুল ? এত বিরামহীন গোলাগুলির পরও কোন মানুষ কি বেঁচে আছে চিৎকার দেয়ার জন্য ? আশ্চর্যের ব্যাপার, একটা কাক, চিল কি কোন পাখির ডাক নেই।

বাউণ্ডারি ওয়ালের এপাশে শরীর রেখে শুধু মুখটা বাড়ালাম গেটের বাইরে, বাঁদিকে তাকালাম মেইন রোডের পানে। জনশূন্য রাস্তা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হয়ত সৈন্যভর্তি জীপ বা ট্রাক চলে যেতে দেখব। কিন্তু দরকার নেই তা আমাদের দেখে। আমার মুখোমুখি বাসাটা হোসেন সাহেবের। উনি খোলা দরজার ঠিক ভেতরেই চেয়ারে এবার বসছেন, আবার উঠে বারান্দায় আসছেন, আবার তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যাচ্ছেন। বাঁ পাশে ডাঃ রশীদের বাড়ি। উনিও অস্থিরভাবে ঘর-বারান্দা করছেন—এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ফিরে, ঘুরে ঢোকার মুখে গাড়ির দিকে নজর পড়তেই আঁতকে উঠলাম। কাচ জুড়ে জ্বলজ্বল করছে সেই স্টিকার।—'একেকটি বাংলা অক্ষর একেকটি বাঙালির জীবন।' দ্রুত ঘরে ঢুকে রুমীকে ডাকলাম, 'রুমী, রুমী, শিগগির গাড়ির স্টিকার উঠিয়ে ফেল।'

ঠিক সন্ধ্যার মুখে কারেন্ট চলে গেল। বাঃ বেশ। এবার ষোলকলা পূর্ণ হল। গোলাগুলির শব্দ একটু কমেছে মনে হল। মিকিও যেন একটু ধাতস্থ হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের এক পাশের ঢাকা জায়গায় তার নিজস্ব জলচৌকিটায় গিয়ে বসেছে। সামান্য কিছু খেয়েছেও।

আমি চার-পাঁচটা মোমবাতি বের করে একতলা দোতলায় তিন-চার জায়গায় বসিয়ে দিলাম। আজ সারাদিন বারেক, কাসেম আমাদের চারপাশেই ঘোরাঘুরি করেছে। সন্ধের সময় বারেক-কাসেমকে বললাম 'তোরা এখুনি তোদের বিছানাপত্র এনে গেস্টরুমে রাখ। অন্ধকারে উঠানে বেরিয়ে কাজ নেই।' ওরা কৃতজ্ঞমুখে দৌড়োদৌড়ি করে বিছানাপত্র এনে রেখে আমাদের কাছাকাছি মাটিতে এসে বসল। মনে হল আমরা সবাই নূহের নৌকায় বসে আছি।

বাড়িতে একটা ভালো রেডিও নেই। এবার ২০ ফেব্রুয়ারির শেষ রাতে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই বাইরে ছিলাম—সেই ফাঁকে বাসায় চোর ঢুকে অনেক জিনিসের সঙ্গে আমাদের ভালো রেডিওটাও নিয়ে যায়। এতদিন কিটির দামী রেডিওটাই ব্যবহার করতাম, ও গুলশানে চলে যাওয়াতে রুমী-জামীর নড়বড়ে টু-ইন-ওয়ানটা দিয়ে কোনমতে কাজ চালাই। কিন্তু এটাতে বিবিসি'র বাংলা সার্ভিসটা ধরা যায় না। আকাশবাণীও ঢাকার রাস্তায় আর্মি নেমেছে, এর বেশি কিছু বলে নি। টিভি বন্ধ। কি আর করি। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজের লোকদের রেহাই দিলাম। সবাই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, হঠাৎ রুমী থমকে দাঁড়াল, 'মিকির কোন সাড়াশব্দ নাই যে ? একেবারে নর্মাল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

জামী বলল, 'ওকে ভেতর আনা হয় নি।'

আবার আমরা সবাই নিচে নামলাম। দরজা খুলে উঠানে নেমে মিকির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখলাম মিকি মরে পড়ে আছে

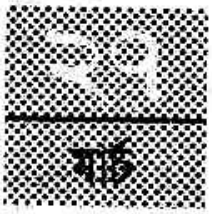

শনিবার ১৯৭১

গতকালও সারারাত জাগা। গোলাগুলির শব্দ, আগুনের স্তম্ভ, ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সকালের দিকে গোলাগুলির শব্দটা খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ হল। তখন সব বাড়ি থেকে মুখ বাইরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। বারেক–কাসেম সাহস করে গেটের বাইরে দাঁড়াল। একটু পরেই দৌড়ে এসে বলল, 'আম্মা, রাস্তায় লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া চলতাছে।'

সেকি ! রেডিওতে তো কারফিউ তোলার কথা বলে নি। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। রেডিও'র ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলে নাশতা দিতে বলে কাপড় বদলাতে গেলাম। সাড়ে আটটায় রেডিওতে কারফিউ তোলার ঘোষণা দেওয়ামাত্র আমি আর রুমী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কামাল বিদায় নিয়ে চলে গেল তার ভাইয়ের বাড়িতে। জামী থাকল বাসায় বাবার কাছে। শরীফ বলল, 'আমি রিকশা নিয়ে বাঁকার ওখান থেকে ঘুরে আসি।'

এলিফ্যান্ট রোডে উঠে বললাম, 'প্রথমে মায়ের বাসায় চল। তারপর হাসপাতালে।'

রুমী বলল, 'আম্মা, আমাকে কিন্তু গাড়িটা দিতে হবে ঘন্টা দুয়েকের জন্য।'

'দেব। আগে দরকারী কাজ সেরে নিই।'

নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারের সামনে পৌঁছেই রুমী হঠাৎ 'ও গড !' বলে ব্রেক কষে ফেলল। সামনেই পুরো কাঁচাবাজার পুড়ে ছাই হয়ে রয়েছে। এখনো কিছু কিছু ধোঁয়া উঠছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মানুষও পুড়েছে। ওই সে পোড়া চালার ফাঁক দিয়ে—'

রুমী জোরে গাড়ি চালিয়ে—'আম্মা, তাকায়ো না ওদিকে' বলে ডানদিকে মিরপুর রোডে মোড় নিল।

ঢাকা কলেজের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে দেখা গেল উল্টোদিক থেকে ওয়াহিদ আসছে হনহন করে হেঁটে, চারদিকে তাকাতে তাকাতে। জুবলী ভাইয়ের ছেলে ওয়াহিদ। রুমীর চেয়ে দু'তিন বছরের বড় হলেও তার বন্ধু। রুমী গাড়ি থামিয়ে ওকে তুলে নিল, 'কোথায় যাচ্ছ বাবু ভাই ?'

'জেবিসদের বাসায়। ওরা বেঁচে আছে কি না জানি না। থাকলে ওদেরকে নিয়ে আসব আমাদের বাড়িতে। ধানমণ্ডি এলাকা খানিকটা নিরাপদ।'

আমি বললাম, 'আগে ছয় নম্বর রোডে গিয়ে মাকে একটু দেখে আসি ? তারপর আমরাও যাব জুবলীদের বাসায়।'

ধানমণ্ডির দিকে তেমন তাণ্ডব হয় নি, তবু দু'নম্বর রোডের ই.পি.আর. থেকে যে শব্দ এসেছে, তাতেই মা আর লালুর রাত-জাগা চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত। দ্রুত স্বরে ওঁদের কুশল জিগ্যেস করে, বাজার–সদাই কিছু লাগবে কি না জেনে নিয়ে, আবার রাস্তায় নামলাম। নীলক্ষেত ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের পঁচিশ নম্বর বিল্ডিংয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক

রফিকুল ইসলাম থাকে। ওয়াহিদের ফুপা। আমাদের পরিবারের সঙ্গেও ওদের খুব ঘনিষ্ঠতা। ওদের ফ্ল্যাটে ঢোকামাত্র খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রক্তাভ চোখ, উস্কখুস্ক চুল নিয়ে রফিক দৌড়ে এল আমাদের দিকে, ফোঁপানোর মত করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বুবু, বুবু, আমরা আর নেই! শিগগির নিয়ে যান আমাদের এখান থেকে।'

রফিকের স্ত্রী জুবলী, ওদের ছেলেমেয়ে বর্ষণ ও মেঘলা—সকলেরই বিধ্বস্ত অবস্থা। পঁচিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের পেছনেই ইকবাল হল। অতএব শেল, মর্টারের ছিটকানো টুকরা, হেভি মেশিনগানের গুলি, সব এসে বাড়ি খেয়েছে পঁচিশ নম্বর বিল্ডিংয়ের দেয়ালে, জানালার কাচে। জানালা ভেদ করে এ পাশের দেয়ালে পর্যন্ত গেঁথে গেছে গুলি। রফিকরা সবাই দু'রাত একদিন খাটের নিচে মেঝেতে মাথা গুঁজে পড়ে থেকেছে।

জুব্‌লী ওয়াহিদকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, ওয়াহিদ বলল, 'কেঁদ না জেবিস্, তোমাদেরকে এক্ষুণি আমাদের বাসায় নিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'জুবলী, তোমরা তাড়াতাড়ি একটা দুটো সুটকেস গুছিয়ে নাও। হাসপাতালে আমার দেওরের মেয়ে আছে। ওকে দেখে এসেই তোমাদেরকে তুলে বাবুর বাসায় দিয়ে আসব।'

পঁচিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে লক্ষ্য করলাম, দলে দলে লোক বাক্স-বোঁচকা ঘাড়ে-মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছে। সমস্ত রিকশা লোকজন-বাক্স-পেটরা বোঝাই হয়ে ছুটে চলেছে। একটাও খালি রিকশা চোখে পড়ল না। পথযাত্রীরা মাঝে-মাঝে প্রাইভেট গাড়ি থামানোর জন্য হাত তুলছে। দু'তিনটি বাচ্চাসহ একটি পরিবার আমাদের গাড়িটি থামিয়ে বলল, 'আমাদের একটু মালিবাগে নামিয়ে দিবেন? একটাও রিকশা পাচ্ছি না।'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'আমাদের নিজেদেরই আত্মীয়স্বজন আনা-নেওয়া করতে হবে। হাসপাতালে আমাদের আগুনে-পোড়া রুগী আছে। আমাদের সময় নেই। মাপ করবেন।'

না পেরে খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এখন মালিবাগে যাবার সময় নেই আমাদের।

হাসপাতালের আউটডোর গেটে ঢোকার আগে রুমী আরেকবার 'ও গড !' বলে ব্রেক কষে ফেলল। পাশেই শহীদ মিনারের স্তম্ভগুলো গোলার আঘাতে ভেঙে দুমড়ে মুখ থুবড়ে রয়েছে। আমার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। একি করেছে ওরা ! শহীদ মিনারের গায়ে হাত ? চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথায় জাল-দেয়া হেলমেট পরা সৈন্য। আমি চাপাস্বরে বললাম, 'রুমী, ভেতরে ঢোক। সময় নেই বেশি।'

গাড়ি পার্ক করে আমরা ছুটলাম আউটডোরের লম্বা করিডোর দিয়ে ভেতরে। পুরো হাসপাতাল-লোকে লোকারণ্য। কেউ এসেছে আহত আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে। কেউ এসেছে নিখোঁজ আত্মীয়-বন্ধুর খোঁজ করতে। ভয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে বহু লোক। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার মুখে বাধা পেলাম। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হাই স্যারের স্ত্রী আনিসা বেগম, মেয়ে হাসিন জাহান, ওর বড় ভাই ও ভাবী এবং বাড়ির অন্য সবাই করিডোরে দাঁড়িয়ে। আনিসা ভাবী ও হাসিন জাহান দু'জনেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে

ফেললেন। হাই স্যার কয়েক বছর আগে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেও তাঁর পরিবার এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাটেই বাস করছেন। ওঁদের চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংটা শহীদ মিনারের ঠিক উল্টোদিকেই। আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম, হাসিন জাহান কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'খালাম্মা, আমাদের বিল্ডিংয়ে আর্মি ঢুকে মেরে-ধরে সব একাকার করেছে, মনিরুজ্জামান স্যার মরে গেছেন, জ্যোতির্ময় স্যার গুরুতর জখম—'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'আমাদের মনিরুজ্জামান স্যার ?' —

'না, বাংলার নয়। স্ট্যাটিস্টিক্সের। খালাম্মা গো, আমাদের বিল্ডিং রক্তে ভেসে গেছে।'

'তোমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকে নি তো ?'

'আমরা বাইরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে সব খাটের তলায় চুপ করে পড়েছিলাম। অনেক ধাক্কাধাক্কি করেছে কিন্তু আমরা টুঁ শব্দটি করি নি। তাই ভেবেছে কেউ নেই। তাই আমরা বেঁচে গেছি। আজ কারফিউ ওঠামাত্রই এককাপড়ে হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিয়েছি।'

ওদের সঙ্গে দু'চার মিনিট কথা বলে ছুটলাম তিনতলার নিউ কেবিনে। এতবড় হাসপাতালের সব তলার প্রশস্ত করিডোরগুলো ভীত, সন্ত্রস্ত, ক্রন্দনরত লোকের ভিড়ে ঠাসা। দু'হাতে লোক ঠেলে এগোতে হচ্ছে। ইমনের কেবিনে ঢুকে দেখলাম আনোয়ার ইতোমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ইমন আধ-মরার মত বিছানায় শুয়ে আছে। ইমনের মা শেলী বরাবরই ধীর, স্থির, শান্ত—সবসময় হাসে। আজও তার স্থিতধী ভাব দেখে অবাক হলাম। এতবড় ধকলের ছাপ তার রাত-জাগা চোখে, এলোমেলো চুলে, কুঁচকানো শাড়িতে অবশ্যই আছে, কিন্তু মুখের হাসিটি অন্তর্হিত হয় নি। হাসপাতালে লাইট নেই, পানি নেই, খাবার নেই, শহীদ মিনারের ওপর ক্রমাগত শেলিংয়ে হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের ওই দিকটা প্রায় বিধ্বস্ত। একটা জানালারও কাচ নেই। দেয়ালগুলো গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা। বহু ডাক্তার সপরিবারে হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এই রুগী সামাল দিলে কি করে ? তুমি খেয়েছ কি এই ক'দিনে ?' ক্লান্ত মুখে একটু হেসে শেলী বলল, 'কোনমতে রুটি, বিস্কুট, ডাবের পানি দিয়ে চালিয়েছি। আর, ডাক্তারের অভাব ছিল না বলে তেমন ঘাবড়াই নি।'

মনে মনে শেলীকে ধন্য ধন্য করে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এসে রুমী বলল, 'আম্মা, একবার সাদের বাসা যেতে চাই।' সাদ আন্দালিব রুমীর একমাত্র বন্ধু—যে রুমীর চেয়ে বয়সে বড় নয় এবং একই ক্লাসে পড়ে।

'রফিকদের আগে বাবুর বাসায় পৌঁছে দিই। কিছু বাজার-সদাই করে তোর নানীকে পৌঁছে দি, তারপর তুই গাড়ি নিয়ে যাস।'

রুমী আমাকে বাড়িতে নামাবার জন্য গেটে গাড়ি ঢোকাতেই দেখি বদিউজ্জামান আমাদের পোর্চে সাইকেল থেকে নামছে।

বদিউজ্জামান বাংলা একাডেমিতে চাকরি করে। বহু বছর থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। তার শ্বশুর আবদুল কুদ্দুস ভুঁইয়ার বাড়ি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পাশেই। বদিউজ্জামানের স্ত্রী কাজল দুমাসের বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়িতে ছিল। বদিউজ্জামান ছিল এলিফ্যান্ট রোডে তার চাচার বাড়িতে। আজ সকালে কারফিউ উঠলে সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শোনে গত দু'রাত একদিনে সেখানে কি তাণ্ডব হয়ে গেছে।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশরা পাক আর্মির সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করার সময় ভুঁইয়া সাহেবের বাড়িসহ পাশেপাশের কয়েকটা বাড়িতেও পজিসান নেয়। পালাবার সময় তারা সারা বাড়িতে অস্ত্র, ইউনিফর্ম সব ফেলে ছড়িয়ে গেছে। এখন ওঁদের আর ঐ বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়। তাই বদিউজ্জামান অন্য নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। প্রথমে ওদের আত্মীয়, সাংবাদিক কে. জি. মোস্তাফার আজিমপুরের বাসায় যায়। কিন্তু কে. জি. মোস্তাফার কারণেই তাঁর বাড়ি নিরাপদ নয়। বরং তাঁরই অন্যত্র সরে যাওয়া উচিত। বদিউজ্জামান তার আরেক পরিচিত মিসেস মেহের দেলোয়ার হোসেনের বাড়িতেও গিয়েছিল। এঁর ছেলেমেয়েদের বদি কিছুদিন পড়িয়েছিল। উনি শুধু কাজলকে বাচ্চাসহ রাখতে পারবেন বলেছেন। এখন বাকিদের ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি বললাম, 'মা'র বাড়ির একতলাটা খালি পড়ে আছে। ওখানে তোমরা সবাই স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।'

অতএব বদিকে নিয়ে আবার মা'র বাড়ি। মা'র সাথে কথা বলে বদিউজ্জামানদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে বাসায় ফিরে এলাম।

মিকির লাশের কথা সবাই ভুলে গেছি। ভুলব না-ই বা কেন ? যা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় সারা সকাল ছুটোছুটি করেছি। সারা ঢাকা জুড়ে সবাই ছুটোছুটি করছে। পরিচিত যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, দু'সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে, যে যা শুনেছে, পরস্পরকে জানিয়ে যাচ্ছে। যত জানছি, ততই মন জগদ্দল পাথরের চাপে বসে যাচ্ছে। এর মধ্যে রুমী অস্থির হয়ে উঠেছে। আমাকে কোনমতে বাড়িতে নামিয়ে আবার ছুটবে বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ নিতে।

যখন খেয়াল হয়েছে, তখন কারফিউ শুরু হতে আর ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট বাকি আছে। এর মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করে মেথর খুঁজে আনা অসম্ভব ব্যাপার। তবু শেষ মুহূর্তে বারেক-কাসেমকে পাঠালাম, পইপই করে বলে দিলাম বেশি দূরে না যেতে। কারফিউ শুরু হলে রাস্তায় দেখলেই মিলিটারি গুলি করবে। সেই ভয়ে তারা দশ মিনিট পরেই ছুটে বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'কোথাও মেথর নেই।'

এই আরেকটা মস্ত দুশ্চিন্তা চাপল মাথায়। কালকের আগে আর মিকির লাশ সরানো যাবে না—এর মধ্যে পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে। একে বিভিন্ন দুঃসংবাদে মন বিধ্বস্ত তার ওপর এই ঝঞ্ঝাট।

শরীফ বাঁকার বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে গাড়িতে বহু জায়গায় ঘুরে অনেক খবর যোগাড় করে এনেছে। রুমীও বন্ধুদের বাড়ি চরকি ঘুরোন দিয়ে অনেক খবর জেনে এসেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী মধুর ক্যান্টিন আর নেই। পুড়ে ছাই হয়েছে। মধুদাও নেই। পাকসেনার গুলিতে মরেছে। স্টাটিস্টিক্‌সের মনিরুজ্জামান সাহেব ছাড়াও আরো অনেক শিক্ষককে পাক আর্মি মেরে ফেলেছে। ডঃ জি. সি. দেব, ডঃ এফ. আর. খান, মিঃ এ. মুকতাদির। কলকাতা রেডিওতে নাকি বলেছে, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম ও বেগম সুফিয়া কামাল পাক আর্মির গুলিতে মারা গেছেন। নীলিমা আপা আর সুফিয়া কামাল আপার কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললাম।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বাঙালি পুলিশরা বেশির ভাগ প্রাণ দিয়েছে।

অল্প কয়েকজন পালাতে পেরেছে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন এখন পাকসেনার গুলিতে ঝাঁঝরা।

পাক আর্মি 'দি পিপল' অফিস পুড়িয়েছে, পুড়িয়েছে ইত্তেফাক অফিস। ঢাকায় যত বাজার আছে, বস্তি আছে, সব জায়গা আগুনে পুড়ে ছাই—ছাই হয়েছে রায়েরবাজার, ঠাটারী বাজার, নয়াবাজার, শাঁখারি পট্টি।

শরীফ প্রত্যক্ষদর্শীর খবর এনেছে বাঁকার কাছ থেকে। বাঁকার বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেড কোয়ার্টার্স। রাত দুপুরে সেখানে গোলাগুলি শুরু হলে বাঁকা আর তার সম্বন্ধী কাইয়ুম ছাদে গিয়ে ব্যাপার দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেন। সেখানে খুব গুলিগোলা চলছে বোঝা যায়, তবে ট্রেসার হাউই ও ছিটকে আসা গুলির জন্য ওঁরা বেশিক্ষণ ছাদে থাকতে পারেন নি। গোলাগুলির শব্দে ওঁদের বাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বাঁকারা সবাই সিঁড়ির নিচে জড়ো হয়ে বসেছিলেন। ভোর চারটের দিকে কয়েকজন ই.পি.আরের লোক পালিয়ে বাঁকাদের বাড়িতে ঢোকে। ওঁদের গ্যারেজের পেছনে মাটির নিচে একটা ঘর আছে, সেই ঘরে আশ্রয় দেয়া হয় লোকগুলোকে। কিন্তু ই.পি.আর. হেডকোয়ার্টার্সের এত কাছে লুকিয়ে থাকতেও তাদের ভরসা হয় নি বোধহয়। তাই সকালের আলো পরিষ্কার হবার আগেই তারা ওখান থেকেও পালিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

বাঁকার বাসার ছাদের পতাকা নামানোর কথা কারো খেয়াল ছিল না। ২৬ তারিখের সকালে পাকিস্তান আর্মির মেশিনগান ফিট করা ট্রাক ধানমণ্ডির রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে দিতে বাঁকার ছাদে পতাকা দেখে বাসার দিকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। বাঁকারা প্রথমে বুঝতে পারেন নি কেন তাঁদের বাসার দিকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। পরে বুঝতে পেরে প্রাণ হাতে নিয়ে বুকে হেঁটে অনেক কষ্টে পতাকা নামিয়ে আনেন।

সবচেয়ে দুঃখজনক খবর ডাঃ খালেকের ভায়রাভাই কমাণ্ডার মোয়াজ্জেমকে পাক আর্মি মেরে ফেলেছে। সায়েন্স ল্যাবরেটরি রোডে কারমো ফোমের মস্ত সাইনবোর্ড আঁটা তিনতলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় তাঁর বাসা ছিল। সাধারণত রাতে তিনি বাড়িতে থাকতেন না, কারণ আগরতলা মামলার অন্যতম 'আসামী' এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোয়াজ্জেমের ওপর আগে থেকেই আর্মির নজর ছিল। মোয়াজ্জেমের দুর্ভাগ্য, ঐ রাতটা তিনি বাড়িতে ছিলেন। মৃত্যু তাঁকে টেনেছিল, তাই বোধ হয়। শুনে খুব কষ্ট হল। মাত্র তিনদিন আগে ২৩ মার্চ তাঁর সঙ্গে দেখা হল। কি হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, আশাবাদী যুবক। তাঁর এই পরিণতি।

শেখ মুজিবের কথা কেউ ঠিক করে বলতে পারছে না। কেউ বলছে তাঁকে মেরে ফেলেছে, কেউ বলছে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ নেতারা কে মরেছেন, কে পালাতে পেরেছেন কিছুই ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। ফোন বিকল, নইলে যারা বলতে পারত এমন লোকের কাছে ফোন করে জানা যেত।

মাথা ঝিমঝিম করছে। উপরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তে লাগল। খানিক পরে রুমী এসে বসল পাশে। গায়ের ওপর হাত রেখে আস্তে বলল, 'আম্মা, তবু তো আমরা পুরো ছবিটা জানি না।'

আমি তার দিকে পাশ ফিরে বললাম, 'তার মানে ?'

'আমরা ক'টা জায়গাতেই বা গেছি। অন্যরাও সব জায়গা নিজের চোখে দেখে নি। কিছু দেখা, কিছু শোনা মিলে যেটুকু জেনেছি, আমার ভয় হচ্ছে আসল ঘটনা তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ। সবটা জানতে মনে হয় আরো ক'দিন লাগবে।'

আমি চেঁচিয়ে কেঁদে ফেললাম, 'আর জানতে চাই না। যেটুকু জেনেছি, তাতেই কলজে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ইয়া আল্লাহ, একি সর্বনাশ হল আমাদের। ওরা কি মানুষ, না জানোয়ার ?'

'ওরা জানোয়ারেরও অধম। ওরা যা করছে, তাতে দোজখেও ঠাঁই হবে না ওদের।'

মার্চ রবিবার ১৯৭১

গত রাতেও ঘুমোতে পারি নি। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে গোলাগুলি চলেছে প্রায় ভোর পর্যন্ত।

কাল বিকেলেই কারেন্ট এসেছে, কিন্তু ফোন এখনো খারাপ। কারেন্ট না এসে যদি ফোনটা ঠিক হত, তাহলে বেশি স্বস্তি পেতাম। শরীফকে বললাম, 'আজ যে করেই হোক, ফোনটা ঠিক করাতেই হবে। তোমার বন্ধু লোকমানকে বল না।'

শরীফ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি পাগল হলে ? মিলিটারি যেখানে সারা ঢাকায় সব ফোন কেটে দিয়েছে, সেখানে তোমার একটা ফোন সারবে কোন ম্যাজিকে ?'

আটটায় কারফিউ উঠতেই কাসেম, বারেক দু'জনকেই পাঠালাম—যে করেই হোক, যত টাকা কবুল করেই হোক, মেথর একটা ধরে আনতেই হবে।

জামী ধরে বসেছে কাল সে বাসায় ছিল, অতএব আজ তাকে বাইরে যেতে দিতেই হবে।

বললাম, 'ঠিক আছে, যাবি। তবে একা নয়। রুমীর সঙ্গে।'

রুমী প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমার অন্য কাজ আছে।'

আমি রেগে রুমীকে কিছু বলতে গেলাম, তার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল। জামী খুলে দিতেই কিটি উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে ঢুকল। তার সঙ্গের মিঃ চাইল্ডার দরজার বাইরে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

'কিটি !' বলে আমি এগিয়ে যেতেই সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ধরেই রইল প্রায় দু'মিনিট, আর ছাড়ে না। তার বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি। একটু পরে জলেভরা চোখ তুলে কিটি অস্ফুট স্বরে বলল 'তোমরা কেমন আছ, দেখবার জন্য এসেছি।'

তিন মিনিটে শরীফ, রুমী, জামী—সকলের কুশল নিয়ে কিটি তক্ষুণি আবার মিঃ চাইল্ডার সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

একটু পরে মিনিভাই এলেন গুলশান থেকে। তাঁর কাছে জানা গেল শেখ মুজিব বেঁচে আছেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'আননোন ডেস্টিনেশানে' নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারা, ছাত্রনেতারা, প্রায় সকলেই পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

শরীফ বলল, 'চলুন ঢাকা ক্লাব ঘুরে আসি একবার।'

রুমী বলে উঠল, 'আব্বু, আমি গাড়িটা নিয়ে যাই একটু।'

আমি বললাম, 'আজ কিন্তু বারোটায় কারফিউ শুরু, মনে থাকে যেন।'

'কেন ? কাল তো বিকেল চারটে পর্যন্ত খোলা ছিল ?'

'বোধ করি, গতকাল লোকজনের অত চলাফেরা দেখে আর্মি আজ সময় কমিয়ে দিয়েছে।'

জামী বলল, 'আব্বু, আমি তোমার সঙ্গে ঢাকা ক্লাবে যাই ?'

মিনিভাইয়ের গাড়িতে শরীফ আর জামী ঢাকা ক্লাবে গেল। আমি রুমীকে বললাম, 'আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একবার হাসপাতাল ঘুরিয়ে এনে দিয়ে তারপর তুই তোর কাজে যাস। ইমন আর শেলীর জন্য একটু খাবার দিয়ে আসব।'

হাঁড়িপানা মুখ করে রুমী আমাকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হল। বললাম, 'শহীদ মিনারের সামনের রাস্তা ধরে যাবি। ফেরার পথে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে আসবি। একাডেমির দেয়াল নাকি গোলার ঘায়ে ভেঙে গেছে। আর রেসকোর্সের কালীবাড়িও নাকি নেই ?'

শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় এসে রুমী গাড়ির গতি কমিয়ে চালাতে লাগল। ডাইনে তাকিয়ে দেখলাম, গতকাল শহীদ মিনারের যে ভাঙা ঊর্ধ্বাংশ দেখেছিলাম, আজ সেটাও নেই। গত রাতের তাণ্ডবে সব অদৃশ্য হয়ে শুধু গোড়া তিনটে রয়েছে। ওগুলো আর ওপড়াতে পারে নি। একটু জোরেই বলে উঠলাম, 'শহীদ মিনার। তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নেবই নেব।'

রুমীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শহীদ মিনার পেরিয়ে হাস-পাতালের গেটে ঢুকে গেল।

রুমী এলিফ্যান্ট রোডে গলির মুখে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। গেটের কাছাকাছি আসতে দেখা হল হোসেন সাহেবের সঙ্গে। উনি চিন্তিত মুখে বললেন, 'শুনলাম পাড়ায় কোন্ বাড়িতে কতো জোয়ান ছেলে আছে, তার লিস্ট হবে।'

শুনে চমকে গেলাম। মনে পড়ল, মেইন রোডের উত্তরদিকের একটা গলিতে কয়েকটা অবাঙালি ছেলে থাকে, যাদের সঙ্গে কয়েক মাস আগে রুমীর ঝগড়া হয়েছিল। ওদের দৌলতে লিস্টে রুমী-জামীর নাম নিশ্চয় প্রথমে বসবে।

বাড়ি ঢুকে রেডিও খুলে রেখে অসহায়ের মত বসে রইলাম। শরীফ বা রুমী না ফেরা পর্যন্ত করার কিছু নেই।

হঠাৎ জানালা দিয়ে কি যেন ঝপ করে মেঝেয় পড়ল। চমকে দেখি খবর কাগজ। দৌড়ে জানালার কাছে গিয়ে ডাক দিলাম, 'বদরুদ্দিন, বদরুদ্দিন, তুমি বেঁচে আছ ?'

বদরুদ্দিন সে-ই ১৯৫৬ সাল থেকে আজিমপুরের বাসায় থাকার সময় থেকে আমাদের

কাগজ দেয়। বদরুদ্দিন রোগা মুখে করুণ হেসে বলল, 'আল্লার রহমত আর আপনাদের দোয়া।'

'আর কোন কাগজ বেরোয় নি ?'

'না, এই একটাই।'

'যেদিন যতগুলো কাগজ বেরোবে, সব দিয়ে যাবে, কেমন ?'

'আচ্ছা।' বলে বদরুদ্দিন চলে গেল। কাগজ পড়ার উত্তেজনায় বদরুদ্দিনকে জিগ্যেস করতে ভুলে গেলাম এ কয়দিন তার কেমন কেটেছে।

২৫ তারিখ রাতের মহামারণযজ্ঞের পর এই প্রথম কাগজ বেরোল—পাকিস্তান অবজারভার। দুই পাতা মাত্র। আট কলাম জুড়ে দুই ইঞ্চি চওড়া হেডলাইন : ইয়াহিয়া ব্রডকাস্টস। ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ। ইয়াহিয়ার ২৬ তারিখ সন্ধ্যার বেতার বক্তৃতার পুরো বিবরণ। তার নিচে বাকি পাতা জুড়ে মার্শাল ল' অর্ডারসমূহের নম্বর ধরে ধরে বিবরণ। একপাশে ছোট্ট হেডিংয়ে খবর : মুজিব অ্যারেস্টেড—মুজিব গ্রেপ্তার।

সকালে রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল আটটা-বারোটা কারফিউ থাকবে না। অথচ এখন পৌনে বারোটায় সেটা বাড়িয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত করা হল। এতে আমাদের সুবিধেই হয়েছে। রুমী-জামীকে মিনিভাইয়ের বাসায় দিয়ে আসা সম্ভব হবে। মিনিভাই বলেছেন গুলশানের বাড়িগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

জামী ঢাকা ক্লাব থেকে ফিরেছে খুব বিচলিত হয়ে। ঢাকা ক্লাবেও আর্মি ঢুকেছিল, কয়েকজন বেয়ারার লাশ আজ সকাল পর্যন্তও পড়েছিল। জামীর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম এরকম ফুলে পচে ওঠা দু'তিনটে লাশ এভাবে দেখা। ভালই হল, গুলশানে টাট্টুর সঙ্গে থাকলে ও সামলে উঠতে পারবে।

দুপুরে খেয়েই রুমী-জামীকে নিয়ে গুলশান চললাম আমি ও শরীফ। রাস্তাঘাট গতকালের তুলনায় বেশ নির্জন। বারোটায় কারফিউ শুরু হবে, সেটা সকালেই জেনে লোকজন সেইভাবে বাড়ি দৌড়েছে। শেষ মুহূর্তে সময় বাড়ালেও জনশূন্য রাস্তাঘাট আর ভরে ওঠে নি।

রুমী-জামীকে গুলশানে রেখে ফেরার পথে আজিমপুরে গেলাম একরাম ভাই লিলিবুর বাসায়।

সোমবার ১৯৭১

রেডিও আজ একচোটেই বলে দিয়েছে আটটা-পাঁচটা কারফিউ থাকবে না।

সকালেই গেলাম গুলশানে, রুমী-জামীকে বাড়ি নিয়ে আসতে। আজ রুমীর জন্মদিন,

অন্তত দুপুরে কিছু রান্না করে খাইয়ে দিই। গিয়ে দেখি কিটি ওখানে বেড়াতে গেছে। গুলশানে বেশির ভাগ বাড়িতে বিদেশীদের বাস—সেখানে চলাফেলার একটু সুবিধে, আর্মির উৎপাতও একটু কম।

ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, কাঁচাবাজার সব পুড়ে নিশ্চিহ্ন, কিছুই পাওয়া যায় না—আজও কি ডাল, আলু দিয়ে খাওয়া হবে ? হঠাৎ চোখে পড়ল এয়ারপোর্ট রোডের সার সার বন্ধ দোকানের মাঝে ছোট্ট একটা গোশতের খোলা দোকানে মাত্র একটি খাসির রান ঝুলছে। তক্ষুণি গাড়ি থামিয়ে রানটা কিনে নিলাম। বললাম, 'রুমী, তোর কপালে পেয়ে গেলাম।'

বাড়ি পৌঁছে দেখি চিংকু আর কায়সার বসে আছে। বললাম, 'ভালোই হল তোমরা এসেছ। আজ রুমীর জন্মদিন। তোমরা দুপুরে ওর সঙ্গে খেয়ে যাও।'

তারপর তিনটে চুলো ধরিয়ে কাসেম, বারেক দু'জনকে খাটিয়ে নিজেও দ্রুত খেটে তৈরি হল পোলাও, কোর্মা আর চানার হালুয়া। গুলশান থেকে আসার সময় রেবা তার বাগানের কিছু টম্যাটো তুলে দিয়েছিল। সেটা দিয়ে সালাদ বানানো হল।

খাওয়ার পর ঢেকুর তুলে জামী বলল, 'ভাইয়ার জন্মদিনের খাওয়াটা ভালোই হল। এমন দুর্দিনে এর বেশি আর কি চাই ?'

খাওয়া–দাওয়ার পর রুমী জামীকে আবার গুলশানে রেখে এলাম।

মার্চ মঙ্গলবার ১৯৭১

সুফিয়া কামাল আপা, নীলিমা ইব্রাহিম আপা বেঁচে আছেন। কলকাতা রেডিওতে ভুল খবর দিয়েছিল। খবরটা জেনে মনটা খুব ভালো হল।

ইংরেজি বিভাগের জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তীদির খবর নেবার জন্য চৌত্রিশ নম্বর বিল্ডিংয়ে গেলাম। পাঁচদিন পরেও সামনের ছোট বারান্দায় পুরু হয়ে জমাট-বাঁধা রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। হাসিন জাহানদের ফ্ল্যাটে এখনো তালা ঝুলছে। বাসন্তীদির ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়লে একজন বুড়োমত লোক বেরিয়ে এসে বলল, কেউ বাড়ি নেই। কোথায় গেছেন জিগ্যেস করাতে বলল, জানে না। জ্যোতির্ময় দাদাবাবুকে কোন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তাও সে জানে না। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। একা একা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করতে সাহস হল না।

একটা একটা করে দিন যাচ্ছে, আর লোকমুখে পাকিস্তানি আর্মির বর্বরতার নতুন নতুন খবর কানে এসে মনমানসিকতা সব অসাড় করে দিচ্ছে। দিনরাত কি এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটছে। আর গুজবই বে কতো। একটা করে গুজব শুনি আর ভয়ে আঁতকে উঠে হটোপুটি

লাগিয়ে দিই। যেমন আজকে এগারোটার দিকে মিনিভাই এলেন রুমী-জামীকে নিয়ে। রুমী-জামী আর থাকতে চায় না গুলশানে। মনে হচ্ছে ভয়ের আর কারণ নেই। ড্রয়িংরুমে বসে গল্পগুজব হচ্ছে। বারেককে মোড়ের দোকানে পাঠিয়েছি চা-পাতা কিনতে। খানিক পরে সে ফিরে এসে ভয়ার্ত মুখে বলল, 'আম্মা ঐ মোড়ের দুকানে একজন বিহারি জিগাইতেছিল রুমী ভাইয়া বাসায় আছে কি না।'

ব্যস অমনি তাড়াহুড়ো লেগে গেল। রুমী-জামীকে তক্ষুণি মিনিভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে তুলে আবার গুলশানে রওনা করিয়ে দিলাম।

আড়াইটার সময় হঠাৎ একটা সুটকেস হাতে অজিত নিয়োগী এসে হাজির। আমরা হতবাক। নিয়োগী দাদার মুখে চার/পাঁচ দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ টকটকে লাল, কাপড়-চোপড় ময়লা, কুঁচকানো, গাল বসে গেছে, চুল জট পাকিয়ে গেছে। অবাক ভাবটা কাটার পর আমি হঠাৎ পাগলের মত হাসতে লাগলাম। "কি নিয়োগী দাদা। রক্তস্রোত নাকি অল্পের জন্য এড়াতে পারা গেছে ?"

শরীফ মৃদুস্বরে ধমক দিল, 'পাগল হলে নাকি ? ওঁকে সুস্থির হতে দাও। বসুন মিঃ নিয়োগী।' শরীফ ওর হাত থেকে সুটকেসটা নিল।

'কোথায় ছিলেন এ কয়দিন।'

সিদ্ধেশ্বরীর এক লোকের গোয়ালঘরের পাশের এক ঘুপচি টিনের ঘরে এ ক'দিন কাটিয়েছেন। মশারি ছিল না, অসম্ভব মশায় ঘুমোতে পারেন নি। খাওয়া-দাওয়া প্রায় জোটে নি বললেই চলে—চা একদমই না। অথচ দিনে ১৫/২০ কাপ চা খাওয়ার অভ্যেস তাঁর।

প্রথমেই ওঁকে দোতলায় রুমীদের ঘরে নিয়ে গেলাম। নিচে রাখতে সাহস পেলাম না—যদি হঠাৎ 'কেউ' এসে পড়ে। ওঁকে গোসল করে কাপড় বদলাতে বলে নিচে এলাম খাবার ব্যবস্থা করতে। খাওয়ার পর এককাপ চা ওঁর হাতে দিয়ে শরীফ ও আমি ওঁর সামনেই আলোচনা করলাম—এ পাড়ার যা অবস্থা, ওঁকে এ বাড়িতে রাখা নিরাপদ হবে না। 'কেউ' এসে ওঁকে দেখে চিনে ফেললেই বিপদ। ধানমণ্ডি ছয় নম্বর রোডে মা ও লালু থাকেন, সেখানে তিনতলার রুমটিতে উনি সবচেয়ে নিরাপদে থাকবেন। কাকপক্ষীও টের পাবে না, কারণ মা'র কাজের লোকজন নেই। বদিউজ্জামানরা নিচতলায় থাকে বটে, কিন্তু তারা এমনভাবে দরজা-জানালা সেঁটে নিঃশব্দে বাসার ভেতর থাকে যে, বাঁইরে থেকে কারো বোঝার সাধ্যি নেই—ও বাসার ভেতর অতগুলো লোক থাকে। বদির পরিবার, তার শ্বশুরের পরিবার, কে. জি. মোস্তাফার পরিবার।

সাড়ে তিনটের সময় ওঁকে নিয়ে মা'র বাসায় গেলাম। গাড়িটা একেবারে বাড়ির সামনে নিলাম না। কি জানি, বদিরা কেউ হঠাৎ যদি কোন কাজে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে! আমি প্রথমে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে নিলাম একতলার সব দরজা-জানালা বন্ধ আছে কি না। তখন মা'র কলিং বেল টিপলাম। লালু এসে দরজা খোলার পর আমার ইশারা পেয়ে শরীফ নিয়োগী দাদাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল। আব্বাজানের পুরনো বন্ধু অজিত নিয়োগী—মা ও লালু খুশি মনেই ওঁকে রাখলেন।

ওখান থেকে গেলাম ভূতের গলিতে, ভাস্তে কলিম, আর চাচাত দেবর নজলু ও হুদাদের বাসায়। ওরা কে কেমন আছে, খোঁজখবর নেয়ার জন্য।

আজ সকালে এক পাতার মর্নিং নিউজ বেরিয়েছে। উল্টো পাতাটা সাদাই রয়ে গেছে। বিদেশের দু'একটা খবর ছাড়া পূর্ব বাংলার খবর মাত্র দু'টি : 'মুজিব ওয়ান্টেড সেপারেশান রাইট ফ্রম সিকটি-সিকস।' ১৯৬৬ সাল থেকেই মুজিব বিচ্ছিন্নতা চেয়ে আসছেন। এবং 'পাকিস্তান সেভড, সেইজ ভুট্টো।' ভুট্টো বলেছেন : পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

বুধবার ১৯৭১

সকালে শরীফ নিজেই বেরোলো মা'র বাজার করার জন্য। অজিত নিয়োগীও বাড়িতে আছেন, একটু বেশি করে বাজার করে দিয়ে আসবে।

শরীফ বেরিয়ে যাবার একটু পরেই দেখি, ওমা ! মা নিজেই রিকশা করে এসে হাজির! কি ব্যাপার ?

মা বললেন, আমি যদি অজিত নিয়োগীর দু'বেলার খাবারটা রান্না করে পাঠাই, তাহলে খুব ভাল হয়। কারণ একটাও কাজের লোক নেই, মা'র শরীর অশক্ত। নিজেরা অনেক সময় এক তরকারি দিয়ে খেয়ে নেন। নিয়োগীকে তো সেভাবে দেওয়া যাবে না।

আরেকটা কাজ বাড়ল। তাতে কোন ঝামেলা নেই, সমস্যা হল রোজ দু'বেলা টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার নেওয়ার সময় ওবাড়ির সামনে কেউ দেখে না ফেলে। এ বাড়িতেও বারেক-কাসেমরা যেন বুঝতে না পারে কোথায় খাবার যাচ্ছে। ওদের বলা হল হাসপাতালে অসুস্থ আত্মীয়ের জন্য খাবার পাঠানো হচ্ছে।

৩১ তারিখে আরো দুটো পত্রিকা বেরিয়েছে—দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ। চারটে পত্রিকাতেই ইস্ট পাকিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার পথে—একথা ফলাও করে লেখা হয়েছে। পূর্বদেশের লেখার মাঝখানে একটা লাইন একেবারে বুকে এসে ঘা মারল: শান্তিপ্রিয় বেসামরিক নাগরিকদের যেসব সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী হয়রানি করছিল, তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়েছে।'

মর্নিং নিউজ হেডলাইন দিয়েছে : ইয়াহিয়াজ স্ট্যাণ্ড টু সেভ পাকিস্তান প্রেইজড।—পাকিস্তান রক্ষায় ইয়াহিয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রশংসিত।

ইয়াহিয়া লডেড ফর রাইট স্টেপস টু সেভ কান্ট্রি—দেশরক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইয়াহিয়া নন্দিত।

অক্ষম রাগে আর অপমানে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেললাম কাগজ দুটো। এছাড়া আর কিইবা করার ক্ষমতা আছে আমাদের।

Ekattorer Dinguli by Janahara Imam

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com